সূরা ফাতিহায় আল্লাহ যা বলেছেন

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

হিদায়াতুল কুরআন সিরিজ-২

সূরা ফাতিহায় আল্লাহ যা বলেছেন

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা প্রকাশনী

সূরা ফাতিহায় আল্লাহ যা বলেছেন
ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

©
গ্রন্থকার

প্রকাশক
কথামালা

বাড়ী ১৪, সড়ক ২৮, সেক্টর ৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০১৬৭৮৬৬৪৪০১
email : kothamalaprokashani@gmail.com; sadeqaub@gmail.com
website: www.aub.edu.bd/home/kothamala
www. aub.edu.bd/home/kothamala-publications

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৭

পরিবেশক
Rokomari.com

মূল্য ১৫০/-

Surah Fatihai Allah Ja Balesen (What Allah said in Surah Fatiha)
Dr.Abul Hasan M. Sadeq
First Edition: November, 2017

Published by: Kothamala
House-14, Road-28, Sector-7, Uttara Model Town, Dhaka-1230
Phone- 01678664401
email : kothamalaprokashani@gmail.com; sadeqaub@gmail.com
website: www.aub.edu.bd/home/kothamala
www. aub.edu.bd/home/kothamala-publications

Price: Tk.150

ISBN: 978-984-92519-1-0

দুটো কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على اشرف
الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين-

কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত জীবনাদর্শের দলিল। কুরআনের ভূমিকা বা সূরা ফাতিহায় সে জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে গোটা কুরআনে। সুতরাং সূরা ফাতিহার বক্তব্য ও মর্ম অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেও তার মর্ম অনুধাবন করার তেমন চেষ্টা নেই, এবং সে সুযোগও নেই। সে উপলব্ধি থেকেই এ বিষয়ে কলম হাতে নিয়েছিলাম। 'সূরা ফাতিহা' শিরোনামে আমার সে বইটি ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করে। এ বইয়ে সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াত, এমন কি কোন কোন আয়াতের খণ্ডাংশের উপর আলাদা আলাদা অধ্যায় রয়েছে যাতে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা আছে। আলহামদু লিল্লাহ, বইটি পাঠকদের নিকট সমাদৃত হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ বইটি প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই সব কপি শেষ হয়ে যায়। এখন অনেকেই সরাসরি আমার নিকট বইটি চাচ্ছেন। প্রকাশনার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এখন বিকল্প ব্যবস্থাপনায় বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো। দ্বিতীয় সংস্করণ পূর্বের চেয়ে আরা সমন্বিত ও সমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 'কথামালা প্রকাশনী' থেকে।

এছাড়া আরেকটি পরামর্শ ও অনুরোধ আসে, বইটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করার। কেননা আজকাল অনেকেই বিস্তারিত বই পড়ার সময় পান না। এই ছোট্ট পুস্তিকায় তা করা হয়েছে। মূল বইটির আয়াতভিত্তিক অধ্যায়গুলো বাদ দিয়ে সূরা ফাতিহার অর্থ, মর্ম ও

শিক্ষাগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে এখানে দেওয়া হলো। সংক্ষিপ্ত টিকা-টিপ্পনীর সাথে মূল বইয়ের 'সূরা ফাতিহার শিক্ষা' অধ্যায়টি দেওয়া হয়েছে। আশা করি তা থেকে সূরা ফাতিহার মূল বক্তব্য এবং সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর মেসেজ ও দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া সহজ হবে।

অতঃপর যারা আরো গভীরে যেতে চান, তাঁরা মূল বইটি দেখতে পারেন।

এ ব্যাপারে আরো কোন পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
১০ মহররম, ১৪৩৯ হিঃ
১ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিঃ

সংক্ষিপ্ত সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুকাদ্দিমাহ্	৭
সূরা ফাতিহা : প্রসঙ্গ কথা	১১
সূরা ফাতিহা, অনুবাদ ও টিকা	২৩
সূরা ফাতিহার শিক্ষা (সূরা ফাতিহায় আল্লাহ যা বলেছেন)	৩০

বিস্তারিত সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুকাদ্দিমাহ্	৭
সূরা ফাতিহা : প্রসঙ্গ কথা	**১১**
(১) সূরা ফাতিহার নামকরণ	১১
(২) সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার সময়	১৩
(৩) সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত	১৪
(৪) সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু	১৫
(৫) সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও ফযিলত	১৯
সূরা ফাতিহা, অনুবাদ ও টিকা	**২৩**
(১) সূরা ফাতিহা	
(২) অনুবাদ ও টিকা	
সূরা ফাতিহার শিক্ষা (সূরা ফাতিহায় আল্লাহ যা বলেছেন)	২৩
(১) আল্লাহতে বিশ্বাস	
(২) আল্লাহ জগতসমূহের ও প্রতিপালক	
(৩) আল্লাহ পরম করুণাময়	৩৩

(৪) সকল প্রশংসা করুণাময় আল্লাহর প্রাপ্য ৩৫
(৫) আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উপায় ৩৬
(৬) আখিরাতে বিশ্বাস ৩৭
(৭) আল্লাহ বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি ৩৮
(৮) সৃষ্টি ও জীবনের উদ্দেশ্য : আল্লাহর ইবাদত ৪০
(৯) ইবাদতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪২
(১০) তাওহীদ বা একত্ববাদ ৪৩
(১১) মানুষের স্বাধীনতা ৪৫
(১২) ইবাদতের সামষ্টিকতা ও সামষ্টিক জীবনের গুরুত্ব ৪৭
(১৩) মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অমুখাপেক্ষী নয় : দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে সাহায্য প্রয়োজন ৪৭
(১৪) সাহায্যের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ : কেবল মাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা ৫০
(১৫) হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা ৫৩
(১৬) হিদায়াত পাওয়ার শর্ত ৫৫
(১৭) সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ ৫৭
(১৮) নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের পরিচয় ৬০
(১৯) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ অনুসরণ ও সঙ্গ গ্রহণ ৬৩
(২০) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে আত্মরক্ষা ৬৪
(২১) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : ক্রোধে পতিত অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের সঙ্গ বর্জন ৬৭
(২২) দোয়া ও প্রার্থনা করার নিয়ম ৬৯
(২৩) সামষ্টিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ৭০
(২৪) কোন কাজ আরম্ভ করার নিয়ম ৭২

মুকাদ্দিমাহ্

(প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى انزل القران على اشرف المرسلين لهداية الجن والانس اجمعين الى صراط المستقيم وارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله – والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين و من تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى من تعلم وعلم القران الكريم وجاهد فى سبيل الله حق جهاده لاقامة الدين لوجه قوله عز وجل ان اقيموا الدين-

সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন বা কুরআনের মূল ভিত্তি, সারমর্ম ও নির্যাস। মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য কুরআন যে জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থা পেশ করে, সূরা ফাতিহা তার একটা সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভূমিকা। এ ভূমিকার রূপরেখা অনুযায়ী গোটা কুরআন সাবলীল ভাষায় এ জীবন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো উপহার দিয়েছে। এরপর তার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন-মুখী বাস্তবায়ন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে, যা সুবিন্যস্ত সুন্নাহশাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ হিসেবে গোটা কুরআন ও সুন্নাহকে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা যায়। সুতরাং সচেতন মন ও গভীর মনোযোগের সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে কুরআন ও সুন্নাহে প্রদত্ত ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো মনের চোখে ভেসে উঠে, ঈমান মযবুত হয়। আল্লাহতে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে প্রদত্ত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির নবায়ন ঘটে।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সূরা ফাতিহা বার বার পাঠ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ নিজেই এর নাম দিয়েছেন 'সাবউল মাছানী' (السَّبْعُ الْمَثَانِي) বা 'বার বার পঠিত সাতটি আয়াত'। বিধান দেওয়া হয়েছে, প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে তা পাঠ করতে হবে। বলা হয়েছে, এ সূরা ছাড়া নামায হয় না। সূরা ফাতিহার গুরুত্ব আছে বলেই এ সূরাটিকে এতো বেশী বেশী পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সাঃ)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকল দেশে সর্বত্র সকল মুসলমান প্রতিদিন কেবল ফরয নামাযেই ১৭ বার সূরাটি পাঠ করে আসছে। ওয়াজিব, সুন্নাহ ও নফল নামাযে আরো বহুবার পাঠ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন কারণে প্রতিদিন এ সূরাটি আরো বহুবার পঠিত হয়।

কুরআনের সারমর্ম ও নির্যাস হিসেবে সূরা ফাতিহার আধ্যাত্মিক মূল্যও অপরিসীম। কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলতেন, 'সূরা ফাতিহা পাঠ করো'। কুরআনের এ সার ও নির্যাস দ্বারা রোগ ভালো হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সূরা ফাতিহা পাঠ করলে এর প্রতিটি কথার জবাব আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে দেন। যেমন, যখন বলা হয় 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' (শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি), তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা যে সাহায্য চেয়েছে আমি তাকে তা দিলাম'। আজ প্রতিটি মুহূর্তে শত সহস্রবার ইয়্যাকা নাস্তাঈন পাঠ করা হচ্ছে, কিন্তু এর অর্থের দিকে খেয়াল করে আল্লাহর সাহায্য কামনার কথা কয়জনের মনে থাকে? সাহায্যের কামনা ও প্রার্থনাই যদি না থাকে, তবে মন্ত্রের মতো কথাগুলো উচ্চারণ করলে কি কাঙ্ক্ষিত ফল আশা করা যায়?

দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেকেরই সূরা ফাতিহার অর্থ ও মর্ম জানা নেই। জানা নেই, আল্লাহ তা'লা সূরা ফাতিহায় কী বলেছেন। যে ছোট্ট সূরাটির এতো গুরুত্ব, যা প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে পাঠ করতে হয়, তার অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা জানা সবার জন্যই প্রয়োজন। জানা উচিত এতে আল্লাহ কী বলেছেন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যাঁরা সূরা ফাতিহার অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ

করতে চান, তাঁরা এ বইটি থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করি। আর যাঁরা এ সূরাটির মর্ম সম্পর্কে আরো গভীরে প্রবেশ করতে চান, তাঁরাও এখানে চিন্তার কিছুটা খোরাক পাবেন বলে আমার ধারণা।

হে আল্লাহ, অধমের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এটিকে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আর একে আমার, আমার পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন ও সকলের নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন!

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ)
মক্কা মুকাররামাহ
২৭ রমযান, ১৪২৬
৩০ অক্টোবর, ২০০৫

সূরা ফাতিহা : প্রসঙ্গ কথা

সূরা ফাতিহা হলো পবিত্র কুরআনের ভূমিকা। আর কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত বা সরল সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা। মানুষের আসল বাড়ি হলো জান্নাত। সেখান থেকে মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ) পৃথিবীতে এসেছেন। এ পৃথিবী থেকে জান্নাতে ফিরে যাওয়ার জন্য একটাই সোজা পথ রয়েছে, যার নাম সিরাতুল মুস্তাকীম। কুরআন সে পথ দেখায়। কুরআন পাঠ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে সে পথ খুঁজে নিতে হবে। সে পথ ধরেই জান্নাতের বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব। হিদায়াতের মহাগ্রন্থ কুরআনে প্রথমেই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে সে সোজা পথের সংক্ষিপ্ত রোডম্যাপ দেয়া হয়েছে।

সূরা ফাতিহা হলো হিদায়াতের মহাগ্রন্থ তথা কুরআনের ভূমিকা বা সূচনা। কোন গ্রন্থের ভূমিকাতে যেমন তার বিষয়বস্তুর প্রতি ইশারা থাকে, তেমনি সূরা ফাতিহা কুরআনের মূল বক্তব্যের ইঙ্গিত বহন করে। এ বিবেচনায় সূরা ফাতিহা হিসেবে সূরাটির নামকরণ যথার্থ।

এ সূরায় ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর ঘোষণা রয়েছে। স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক, আখিরাত ও শেষ বিচার ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এ সূরায়। এসব বিশ্বাসই ইসলামী জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তি।

(১) সূরা ফাতিহার নামকরণ

সূরা ফাতিহার একাধিক নাম আছে। এ সূরাটির সবচেয়ে বেশী পরিচিত ও ব্যবহৃত নাম সূরা ফাতিহা। 'ফাতিহা' মানে উন্মোচনকারী, ভূমিকা বা সূচনা। সূরা ফাতিহা হলো কুরআনের প্রথম সূরা। এ সূরা দিয়েই কুরআন শুরু। যে কোন বই বা গ্রন্থের শুরুতে তার ভূমিকা ও অবতরণিকা থাকে, যাতে পাঠক প্রথমেই গ্রন্থটি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ

ধারণা পেয়ে যায়। সূরা ফাতিহাও কুরআনের ভূমিকা বা অবতরণিকার কাজ করে। কুরআন ইসলামী জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থাসহ ইসলামের সকল প্রকার বিধি-বিধান ও অনুশাসন পেশ করে, যাকে এক কথায় সিরাতুল মুস্তাকীম বা 'ইসলাম' বলা হয়। এ কুরআনের ভূমিকা হিসেবে সূরা ফাতিহায় ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এ সূরা হলো কুরআনের ভূমিকা (ফাতিহা)। একই যুক্তিতে সূরাটিকে 'ফাতিহাতুল কিতাব'(কিতাব উন্মোচনকারী, কিতাবের ভূমিকা বা সূচনা)-ও বলা হয়।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ' হলো 'উম্মুল কুরআন', 'উম্মুল কিতাব' ও সাবউল মাছানী'।

এ হাদিসটি থেকে সূরাটির আরো চারটি নাম জানা যায় : 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'উম্মুল কুরআন', 'উম্মুল কিতাব' ও 'সাবউল মাছানী'।[১]

সূরা 'আল-হামদুলিল্লাহ' এজন্য যে 'আল-হামদুলিল্লাহ' দ্বারা সূরাটি শুরু হয়েছে। এছাড়া এ সূরাটি, অর্থাৎ গোটা কুরআনই শুরু হয়েছে এ ঘোষণা দিয়ে যে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। কারণ, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মালিক। এ ঘোষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর সেহেতু 'সূরা আল-হামদুলিল্লাহ' নামকরণ যথার্থ।'উম্মুল কিতাব' অর্থ 'কিতাবের মা' (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের মা) এবং 'উম্মুল কুরআন' মানে 'কুরআনের মা'। আরবী ভাষায় "উম্ম্" বলে বুঝানো হয় "মূল" ও "সারবস্তু"। যেহেতু এ সূরায় কুরআনে বর্ণিত ইসলামী জীবন-দর্শনের সকল মৌলিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে, সেহেতু এ সূরাটি হলো আল্লাহর কিতাব কুরআনের মূল ও সংক্ষিপ্ত সার।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "সালাত আমার ও বান্দার মধ্যে বিভক্ত।"[২] এখানে সালাত বলে সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে।

---

১ বুখারী হাদিস নং-৪৭০৪

২ হাদিসটি হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম: কিতাবুস সালাত: হাদিস নং-৩৮ ।

হাদিসটির অর্থ এই যে, সূরা ফাতিহার কিছু অংশে আল্লাহ, আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর ইবাদত ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু অংশে বান্দার নিজের জন্য দোয়া, সাহায্যের কামনা ইত্যাদি রয়েছে। হাদিসটির বাকি অংশে সূরা ফাতিহার কোন্ অংশ আল্লাহর জন্য, আর কোন্ অংশ বান্দার জন্য তা বর্ণিত হয়েছে।[৩]

সূরা ফাতিহাকে 'সূরা শেফা'ও বলা হয়। "সূরা ফাতিহা হলো সকল রোগ থেকে শেফা বা মুক্তি।" রোগমুক্তির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এ সূরায় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া রয়েছে। আর তা হলো সত্যপথ বা হিদায়াতের দোয়া। হিদায়াত প্রার্থনার গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে এটিকে 'সূরা দোয়া' বলা হয়।

এ সূরায় প্রভূত কল্যাণ লাভের দিকদর্শন রয়েছে। এ হিসেবে 'সূরা কানয্' বা 'কল্যাণের খনি' সূরা বলা হয়। এক হাদীসে আছে, এ সূরা আললাহর আরশের নীচে অবস্থিত এক খনি থেকে নাযিল হয়েছে।[৪]

সূরা ফাতিহার আরো নাম আছে। যেমন, 'সূরা কাফিয়া' (سورة الكافيه), 'সূরা ওয়াফিয়াহ' (سورة الوافيه), 'সূরা সুয়াল' (سورة السوال), 'সূরা শুকর' (سورة الشكر), 'সূরা তাফভীজ' (سورة التفويض), 'সূরা তালীমুল মাসআলা' (سورة تعليم المسئله) ইত্যাদি। এসব নামকরণের পেছনে যৌক্তিক কারণও আছে। তবে সাধারণত সূরাটি সূরা ফাতিহা নামে সর্বাধিক পরিচিত।

(২) সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার সময়

সূরা ফাতিহা হলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর প্রথম দিকের সূরা। সর্বপ্রথম 'ইকরা বিসমি রাব্বিকা' নাযিল হয়েছে, এটিই

---

৩ হাদিসটির উল্লেখিত অংশটি একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশ। হাদিসটির বাকি অংশে সূরা ফাতিহার কোন অংশ আল্লাহর জন্য (যেমন, সমস্ত প্রসংসা আলাহর জন্য) আর কোন অংশ বান্দার জন্য (যেমন, হিদায়াতের দোয়া) তা বর্ণিত হয়েছে।

৪ দেখুন, মা'আরেফুল কুরআন: শাইখুত্তাফসীর ইদ্রীস কান্ধলভী, ১ম খণ্ড।

হলো স্বীকৃত অভিমত। তবে অন্য বর্ণনা মতে সূরা ফাতিহা প্রথম নাযিল হয়েছে। আসলে এ দু'টি মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 'ইকরা বিসমি রাব্বিকা...' সহ আরো কিছু খণ্ড খণ্ড আয়াত[৫] প্রথম দিকে নাযিল হলেও একটা পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সূরা ফাতিহাই প্রথম সূরা। সারকথা, সূরা ফাতিহা নবুওয়তের প্রথম দিকের সূরা।

(৩) সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত

সূরা ফাতিহা শেষ নবী (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরা। সে সময়কার অবস্থা, বিশেষ করে আরবের অবস্থা বিবেচনা করলেই সূরাটির প্রেক্ষিত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের সকল দিক দিয়েই মানুষ তখন ভ্রষ্টতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারা জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও যুক্তির পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার দ্বারা পরিচালিত হতো। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

প্রথম, ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা সাধারণত কোন না কোন উপাস্যে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সে বিশ্বাস ছিল বিচিত্র ধরণের। কেউ কেউ নিজ হাতে প্রস্তর-মূর্তি নির্মাণ করে তাকে উপাস্যের আসনে বসিয়ে দিতো, তার উপাসনা করতো এবং তাকে ভাগ্য বিধাতা হিসেবে বিশ্বাস করতো। এমন উপাস্যের সংখ্যাও ছিল অনেক। কা'বা ঘরেই ছিল ৩৬০টি মূর্তি। আবার কেউ ছিল অগ্নিপূজক, যারা আগুনের পূজা করতো। কেউ বিশ্বাস করতো ত্রিত্ববাদে, যারা তিন উপাস্যের উপাসনা করতো (আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র যিশুখ্রিষ্ট ও তাঁর মাতা ম্যারী বা মরিয়ম)।

দ্বিতীয়, তাদের এই ধর্মবিশ্বাস প্রধানত বিশ্বাস ও উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মানবজীবনে সে ধর্মবিশ্বাসের কোন প্রায়োগিক প্রতিফলন ছিল না। অর্থাৎ তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী কোন জীবন-ব্যবস্থা ছিল না, জীবনের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। বরং

---

[৫] যেমন সূরা মুদ্দাসসির ও সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম কয়েকটি আয়াতও নবুওয়তের প্রথম দিকে নাযেল হয়েছে বলে বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে তাফসীর গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এর প্রধান দিক ছিল উপাস্যের উপাসনা করা এবং ভাগ্য বিধাতা হিসেবে তাদের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। সুতরাং তাদের বাস্তব জীবনে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আদর্শিক বিধি-বিধান বা নীতি-নৈতিকতার বালাই ছিল না।

তৃতীয়, যেহেতু বাস্তবজীবনে তাদের কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বা বিধি-নিষেধ ছিল না, সেহেতু জবাবদিহিতারও প্রশ্ন ছিল না। কাজেই তাদের বিশ্বাসে আখিরাতের স্থান ভূমিকা ছিল না। তাদের অনেকেই মনে করতো, আখিরাত বলে কিছু নেই। মৃত্যুর পর পঁচে-গলে যাওয়া মানবদেহের পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

চতুর্থ, ধর্মীয় জীবনাদর্শের বাধ্যবাধকতা ও আখিরাতের জবাবদিহির চেতনা না থাকায় তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। জোর যার মুল্লুক তার, এটাই ছিল নীতি। গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলা ছিল সমাজের সাধারণ চিত্র। সামাজিক অবস্থা এতো নীচে চলে গিয়েছিল যে, শক্তিশালী গোত্রের মানুষ কর্তৃক দুর্বলের উপর রাতনিশীথে আক্রমণ করে সর্বস্ব লুট করে নেওয়া এবং তাদের সুন্দরী মেয়ে ও নারীদেরকে নিয়ে ভোগের আসর বসানোকেও গর্বের বিষয় মনে করা হতো। এসব গৌরবগাঁথা কাব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হতো এবং তা কা'বা ঘরে টানিয়ে রাখা হতো।

এক কথায় তখনকার সময়টা ছিল কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার এক বাস্তব উদাহরণ। এ কারণেই মানব ইতিহাসে সে সময়টি আইয়ামে জাহেলিয়্যা বলে পরিচিত ও অভিহিত।

(৪) সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু

এমন জাহেলী প্রেক্ষাপটেই মানুষকে সুপথে নিয়ে আসার জন্য শেষ নবী (সাঃ) শান্তির দীন ইসলাম নিয়ে আসেন। এ দীনের মৌলিক দলিল হলো কুরআন, যার ভূমিকা হলো সূরা ফাতিহা। সূরা ফাতিহায় মানুষকে উপরে উল্লেখিত সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে বাঁচিয়ে সঠিক ধারায়

ফিরিয়ে আনার প্রয়াস রয়েছে। সব কল্পকাহিনী বাদ দিয়ে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহতে বিশ্বাস, জীবনের উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা, সে জবাবদিহির জন্য বিচার ও বিচার দিবস, এবং বিচারের রায় অনুযায়ী আখিরাতের অনন্তকালীন জীবন, এসব বিশ্বাস সূরায়ে ফাতিহার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষেপে সূরা ফাতিহায় ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়সমূহের দিকনির্দেশনা রয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে গোটা কুরআনের সর্বত্র। সংক্ষেপে এর বিষয়বস্তু হলো নিম্নরূপ।

প্রথম, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য', প্রথমেই এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হলো আল্লাহতে ঈমান। এ জগত এমনিতেই অস্তিত্বে আসেনি, বরং এর পেছনে রয়েছেন এক মহাশক্তিশালী স্রষ্টা, আল্লাহ। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। সুতরাং তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী।

দ্বিতীয়, আল্লাহ শুধু স্রষ্টাই নন, তিনিই গোটা সৃষ্টিজগতের সবকিছুর প্রতিপালক, রক্ষক ও ব্যবস্থাপক। তিনি রাব্বুল আলামীন। সৃষ্টিজগতের যেখানে যখন যা যেভাবে প্রয়োজন, তিনি তখন সেভাবে তার ব্যবস্থা রেখেছেন।

তৃতীয়, আল্লাহ গোটা সৃষ্টিজগতের যে মহা আয়োজন করেছেন, তা অনর্থক হতে পারে না, বরং তার কোন মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। তা হলো আল্লাহর ইবাদত। সূরা ফাতিহার মাধ্যমে সে ইবাদতের প্রত্যয় ও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়, 'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি'। ইবাদতের অর্থ অনেক ব্যাপক। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কয়েকটি নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সাথে সাথে জীবনের সকল দিক ও পর্যায়ে আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান গ্রহণ ও অনুসরণ করা। গোটা কুরআন হলো সে জীবন-বিধানের দলিল। বলাবাহুল্য, এই ইবাদতের ঘোষণার মাধ্যমে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। সম্পর্ক হলো দাসত্ব ও বন্দেগীর। দাস যেমন মনিবের ইচ্ছার নিকট নিজ

ইচ্ছাকে বিলীন করে দেয়, মনিবের সকল আদেশ নিষেধ শিরোধার্য করে নিয়ে তাঁর খুশীর জন্য সবকিছু করে, মানুষও দুনিয়াতে দাসত্ব করবে এবং আল্লাহর দেয়া মিশন বাস্তবায়নের জন্য সবকিছুই করবে। সূরা ফাতিহায় আল্লাহর ইবাদতের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যয় ব্যক্ত করে স্রষ্টা ও মানুষের এ সম্পর্ককে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ, এ পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়, বরং আখিরাতে রয়েছে অনন্তকালের জীবন। এ মহাসৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মানুষ ও জিন জাতিকে। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার জন্য রয়েছে কিয়ামতের বিচার দিবস, যার একচ্ছত্র অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ। সে বিচারের ফলাফল অনুযায়ী রয়েছে অনন্তকালের জান্নাত ও জাহান্নাম। সূরা ফাতিহায় রয়েছে বিচার দিবসে আল্লাহর একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার ঘোষণা ও বিশ্বাস, যার মধ্যে আখিরাতের অস্তিত্ব ও কিয়ামতের বিচারসহ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পঞ্চম, আল্লাহ হলেন একা, একক ও অদ্বিতীয়। সূরা ফাতিহায় একমাত্র তাঁর ইবাদতের ঘোষণা দেওয়া হয় (ইয়্যাকা না'বুদু), কারণ একমাত্র তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সেহেতু সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর, এবং শুধু তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে। এভাবে সূরা ফাতিহায় একাধিক উপাস্যের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়। এর সার কথা হলো তাওহীদ।

ষষ্ঠ, সূরা ফাতিহায় রয়েছে বন্দেগীর দায়িত্ব এবং মিশন পালন ও সত্য-সোজা পথে চলার ব্যাপারে আল্লাহর হিদায়াত কামনা; আর এ কামনার মাধ্যমে ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি করা, যাতে হিদায়াতের গ্রন্থ কুরআন থেকে কাম্য ও বাঞ্ছিত হিদায়াত পাওয়া যায়। বস্তুত কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত।[৬] সৃষ্টির উৎস কি, মানুষ কোত্থেকে এলো, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিভাবে সে উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়, সে উদ্দেশ্য হাসিল করলে কী হবে, আর তা না করলে কী পরিণতি হবে, কুরআন এমন সকল প্রশ্নের জবাব দেয়। এক কথায়

---

৬ আল-কুরআন ২:২।

যে জান্নাত থেকে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, কুরআন সেখানে ফিরে যাওয়ার সহজ সরল সোজা পথই প্রদর্শন করে। সে পথের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কুরআনের ভূমিকা হিসেবে সূরা ফাতিহায় অর্থাৎ কুরআন পাঠের শুরুতেই সে হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা লাভের দোয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য সহায়ক ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়।

সপ্তম, সূরায় ফাতিহায় রয়েছে কুরআনে বর্ণিত মানব ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণা। এতে রয়েছে তাদের পথে হিদায়াতের দোয়া, যাঁরা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন. আর অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে বাঁচার দোয়া। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময় যাঁরা আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছেন, কুরআনে তাদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের মতো অনুগ্রহ লাভের সক্রিয় কামনা ও দোয়া হলে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। সাথে সাথে বর্ণিত হয়েছে বাতিলপন্থী তথা আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ প্রত্যাখ্যানকারীদের করুণ পরিণতির ইতিহাস। সে পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে বাতিল ত্যাগ করে সত্যের পথে চলতে হবে, যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে রয়েছে।

সারকথা, সূরা ফাতিহা পাঠ করা মানে আল্লাহ ও আল্লাহর একত্ববাদসহ ইসলামী জীবন-দর্শনের সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমানের ঘোষণা দেয়া। 'ইয়্যাকা না'বুদু' বলে ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, জীবন সার্থক হয়। কিন্তু সূরা ফাতিহা থেকে এ ফায়দা তখনই পাওয়া যাবে, যখন এ সূরার বক্তব্যকে হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হবে। শুধু মন্ত্রের মতো পাঠ করলে সে ফল কীভাবে লাভ করা যাবে? সে জন্য সূরা ফাতিহার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথে হৃদয়ের গভীরে তার উপলব্ধি থাকতে হবে, দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, এবং প্রতিটি কথা ও ঘোষণার দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি

থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এ সূরার প্রকৃত অর্থ ও মর্মই যদি জানা না থাকে, তা হলে এমন উপলব্ধি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

(৫) সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও ফযিলত

সূরা ফাতিহা ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিশ্বাস ও বিষয়গুলো উপস্থাপন করে, এবং সত্যপথে হিদায়াতের দোয়ার মাধ্যমে সুপথে চলার ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করে। সুতরাং এ সূরা বার বার পাঠ করা এবং এর মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম ও অনুসরণ করা যরূরী। এ কারণেই প্রতিটি নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। আর নামাযের বাইরেও সূরাটি বেশী বেশী পাঠ করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ প্রেরণা দিতে গিয়ে সূরা ফাতিহার প্রচুর ফযিলতের কথা একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।[৭]

১। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে উম্মুল কুরআন পাঠ করে না তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।.... কেননা আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে নামাযকে আমি দু'ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। বান্দা "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বললে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে; আর যখন সে "আর রাহমানির রাহীম" বলে তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে। আর যখন সে বলে "মালিকি ইয়াউমিদ্দীন", তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে (আবার কখনো আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সমগ্র ক্ষমতা আমার প্রতি ন্যাস্ত করেছে)। যখন সে বলে,

---

৭ এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাসীর (১ম খণ্ড), পৃঃ ১০-১৩; তাফসীরে কবীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯-৬১, ।

"ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ী'ন" তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। যখন সে বলে "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম" "সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন" তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়।[৮]

২। উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা "উম্মুল কুরআন" এর অনুরূপ কোন কিছু তাওরাত ও ইঞ্জিলে নাযিল করেননি। আর তা হলো পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত, যা আমি (আল্লাহ) এবং আমার বান্দাদের মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত।[৯]

৩। ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) ও জিবরীল (আঃ) উপবিষ্ট ছিলেন, তখন হঠাৎ উপরের দিক থেকে (এক ধরনের) শব্দ শুনতে পেলেন। তখন জিবরীল (আঃ) আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, এটা আকাশের একটি দরজা যা কখনো খোলা হয়নি। ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করে নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে দু'টি নূরের (দ্যুতির) সুসংবাদ দিচ্ছি যা আপনাকেই দেয়া হয়েছে, আপনার পূর্ববর্তী কোন নবীকে দেয়া হয়নিঃ (১) সূরা ফাতিহা ও (২) সূরা বাকারার শেষাংশ। এর একটি অক্ষর পাঠ করলেও তার মহা প্রতিদান দেওয়া হবে।[১০]

৪। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে (এক জায়গায়) অবতরণ করলাম। সেখানে একটি মেয়ে এসে

---

৮ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং- ৩৮।

৯ নাসাঈ, হাদিস নং- ৯১৩ ও তিরমিযি, হাদিস নং- ৩১২৫।

১০ মুসলিম, কিতাবুল মুসাফিরীন, হাদিস নং- ২৫৪।

বললো, এ গ্রামের প্রধানকে সাপে দংশন করেছে, কিন্তু আমাদের কোন পুরুষ লোক নেই। তোমাদের মাঝে কি ওঝা আছে? তখন এক ব্যক্তি মেয়েটির সাথে গিয়ে তাকে ঝেড়ে এলো। আমরা তাকে দোষারোপ করিনি। এতে গ্রাম-প্রধান আরোগ্য লাভ করলো। ফলে তাকে ত্রিশটি বকরী উপহার দেয়া হলো এবং সে আমাদেরকে দুধ পান করালো। আমাদের সঙ্গী ফিরে এলে আমরা তাকে বললাম, তুমি কি ভালো ঝাড়তে পার, না তুমি ওঝা? সে বললো, "না, আমি শুধু উম্মুল কুরআন দ্বারা ঝেড়েছি।" তখন আমরা সবাইকে বললাম, রাসূল (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তোমরা এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলো না। অতঃপর আমরা মদীনায় পৌঁছে নবী করিম (সাঃ)-কে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, সে কিভাবে জানলো যে এটা একটি মন্ত্র![১১]

৫। হযরত আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রাঃ) বলেন, আমি নামায পড়ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ) আমাকে ডাকলেন। আমি নামায শেষ করেই তাঁর ডাকে সাড়া দিই। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি আমাকে বললেন, "আমার কাছে আসা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখলো!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।" তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নি যে, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন তোমাদেরকে ডাকেন সে বস্তুর দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।" অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, "মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের একটি মহান সূরা শিক্ষা দিব"। অতঃপর যখন তিনি আমার হাত ধরে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে কুরআনের একটি মহান সূরা শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছিলেন।"

---

১১ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং- ১৭২৭।

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তা হলো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন । তা হলো সাতটি পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে ।"[১২]

এ হাদিসগুলো থেকে বুঝা গেলো, সূরা ফাতিহায় প্রচুর বরকত ও ফযিলত রয়েছে। এ সূরাটি থেকে ফযিলত লাভ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। তবে এখানে একটা বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, প্রেক্ষাপট, স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী সবকিছুর ফযিলত ও মূল্যায়নে পার্থক্য হয়। একটি অভিজাত এলাকার জমির যে মূল্য, অনুন্নত এলাকায় সমপরিমাণ জমির মূল্য তার নিকটেও পৌঁছতে পারে না। কুরআন পাঠের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। মনোযোগের সাথে মর্ম অনুধাবন করে, তার প্রতি পূর্ণ ঈমানের সাথে, এবং তা অনুসরণের মানসিকতা ও প্রতিশ্রুতি সহকারে সূরা ফাতিহা বা কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ করা, আর না বুঝে না শুনে মন্ত্রের মতো শুধু উচ্চারণ করা এক কথা নয়। এ দু'ধরনের পাঠকারী সূরা ফাতিহা বা কুরআন থেকে একই রকম ফযিলত আশা করতে পারে না। সুতরাং যে সূরা ফাতিহা প্রত্যেক দিন এতোবার পাঠ করা হয়, তার মর্ম ও অন্তর্নিহিত বাণীকে বুঝে-শুনে এবং হৃদয়ঙ্গম করেই পাঠ করা উচিত। নামাযের বাইরে এবং নামাযের ভিতরে প্রতি রাকাতে এরূপ মানসিক উপলব্ধি ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি সহকারেই সূরা ফাতিহা পাঠ করা উচিত। তবেই এ সূরার পূর্ণাঙ্গ ফযিলত ও কল্যাণ পাওয়া যাবে।

---

১২ বুখারী, হাদিস নং- ৪৬৪৭।

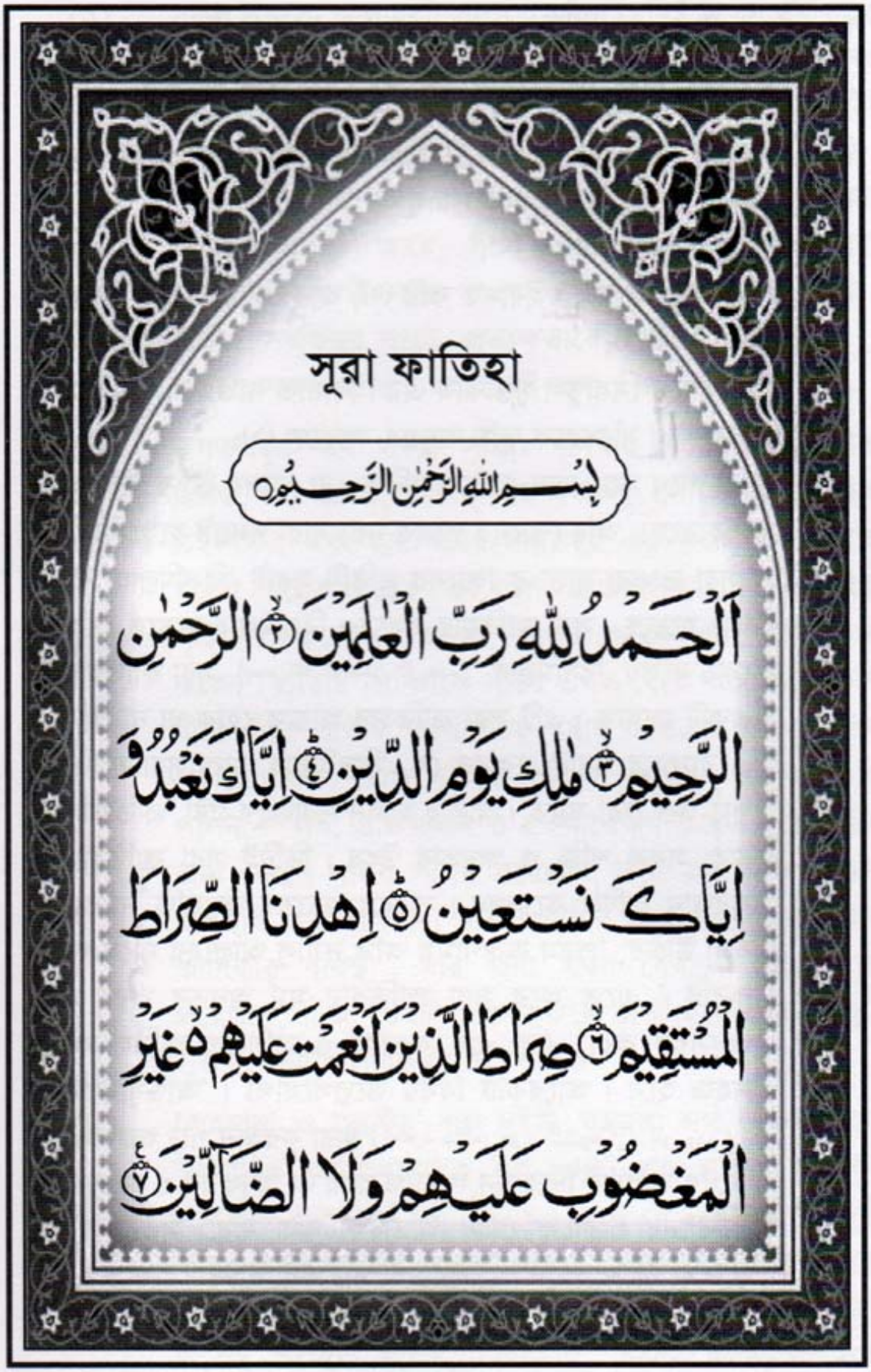
সূরা ফাতিহা
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ۝٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ
اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

অনুবাদ ও টিকা

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। (১)

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য (২) যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক (৩)
(২) তিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু (৪);
(৩) বিচার দিবসের মালিক (৫);
(৪) আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি (৬), আর শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৭);
(৫) আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীম এর হিদায়াত দাও (৮);
(৬) তাঁদের পথে যাঁদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছো (৯);
(৭) তাঁদের পথে নয়, যারা ক্রোধে পতিত (বা যাদের উপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে), আর (তাদের পথেও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (১০)।

(১) সূরা তাওবা ছাড়া কুরআনের প্রতিটি সূরাই 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা শুরু হয়েছে। সূরা ফাতিহার প্রথমেও বিসমিল্লাহ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, বিসমিল্লাহ (بسم الله الرحمن الرحيم) সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত। এটি সূরা ফাতিহার আয়াত হোক বা না হোক, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা সূরা ফাতিহা পাঠ শুরু করা সুন্নত। আল্লাহ হলেন সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তিনিই সূরা ফাতিহাসহ কুরআন নাযিল করেছেন। সুতরাং হৃদয়ের অনুভূতি সহকারে বলা উচিত, 'পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।' এতে করে সূরা ফাতিহার মর্ম অনুভব করা, তা অনুসরণ করা, এবং এর বরকত ও ফযিলত হাসিল করা সহজ হবে। আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। 'আউযুবিল্লাহ' (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) দ্বারা কুরআন পাঠ শুরু করার নির্দেশ আল্লাহই দিয়েছেন,[১৩] যাতে করে তা অনুধাবন ও অনুসরণে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। সুতরাং সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করা উচিত।

---

১৩ আল কুরআন ১৬:৯৮।

(২) সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, কেননা তিনিই হলেন সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। পৃথিবী, সৌরজগত, গ্যালাক্সিসমূহ এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে, অর্থাৎ সকল সৃষ্টিজগতের রূপকার, স্রষ্টা ও প্রতিপালক হলেন আল্লাহ। আদিতে তিনি, অন্তেও তিনি। শেষ বিচারের মালিকও তিনি। সৃষ্টির প্রতি যতো নিয়ামত-অনুগ্রহ আছে, সবই তাঁর। সৃষ্টি জগতের কারো মাধ্যমে কোন উপকার পাওয়া গেলে তার উৎসও তিনি। তিনিই সবকিছুর দাতা, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

(৩) জগতসমূহ অর্থ সকল সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রাণীজগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত, জল-স্থলসহ সবকিছু; সৌরজগতের সকল গ্রহ-নক্ষত্র এবং ছায়াপথের সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ হলেন জগতসমূহের রব, বা প্রতিপালক। তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের লালন করেন, পালন করেন এবং প্রতিপালন করেন। প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টির প্রথম থেকে শুরু করে তিনি ধীরে ধীরে প্রতিটি স্পর্শকাতর পর্যায় অতিক্রম করিয়ে শেষ পর্যায়ে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিতে পরিণত করেন। এরপর তার লালন, পালন, প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যে সৃষ্টির জন্য যেরূপ লালন পালন প্রয়োজন, তার জন্য ঠিক সেরূপ ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর জন্য আল্লাহ রেখেছেন জীবিকার ব্যবস্থা। যার জন্য যখন যেখানে যেরূপে যা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সবকিছু। সুতরাং তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক।

(৪) 'রাহমান' ও "রাহীম' শব্দ দুইটি 'রহমত' শব্দ থেকে থেকে উৎসারিত আধিক্যবোধক শব্দ। দুটি শব্দ দ্বারাই আল্লাহর সীমাহীন করুণা ও দয়া বুঝায়। কেউ কেউ বলেন, এ দুটি শব্দে একই মাত্রার করুণা বুঝায়। তবে আল্লাহর অপার করুনার প্রতি জোর দেওয়ার জন্য দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অনেকে বলেন, "রাহমান" হলো "রাহীম" থেকে

ব্যাপকতর। এ হিসেবে কারো কারো মতে 'রাহমান' দ্বারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর করুণার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা আখিরাতের করুণার চেয়ে অধিক। কারণ, দুনিয়াতে সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থী সবাই আল্লাহর দয়া ও নিয়ামত পায়, আল্লাহ ও তাঁর দীনের শত্রুদেরকেও তিনি জীবিকা ও অন্যান্য নিয়ামত দেন। আখিরাতে শুধু সত্যপন্থীরাই আল্লাহর দয়া ও করুণা পাবে, বাতিলপন্থীরা পাবে শাস্তি।[১৪] সুতরাং রাহীম দ্বারা আখিরাতের করুণা বুঝানো হয়েছে। সারকথা, আল্লাহ হলেন পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। আল্লাহর দয়া ও করুণার চিহ্ন ও বিস্তৃতি সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। সবকিছুর সদয় ও সযত্ন সৃষ্টি, অস্তিত্ব, কল্যাণময় জীবনের দিকনির্দেশনা, ক্ষমাসুন্দর আচরণসহ সবকিছুতেই আল্লাহর সীমাহীন করুণা ও দয়া চিরভাস্বর। এমন করুণাময় হওয়া সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়াতে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তা হলো সন্তানকে সুপথে রাখার জন্য মা-বাপের শাসনের মতো, তা-ও করুণা। দুনিয়ার শাস্তি মানুষেরই কর্মফল।[১৫] অপরিদকে আখিরাতে পাপ ও অপরাধের শাস্তিও করুণা, কারণ সত্যবিরোধী যালিমদেরকে অপরাধের শাস্তি না দিলে তা হবে ত্যাগী সত্যপন্থীদের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা, চরম নির্দয় আচরণ।

(৫) উল্লেখ্য, আল্লাহ সর্বত্র সবকিছুরই মালিক, শুধু আখিরাতের নয়। কিন্তু এখানে শুধু বিচার দিনের মালিক বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিনের গুরুত্ব, বড়ত্ব, ও মহত্ত্ব বুঝাবার জন্য এখানে শুধু বিচার দিবসের উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ দুনিয়াতে কিছু ক্ষমতা খাটাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কিয়ামতের বিচার দিবসে কারো টু শব্দটি করার ক্ষমতা থাকবে না। সেদিনের একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ। সেখানে আইনজীবিদের যুক্তিতর্কে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য

১৪ আল কুরআন ৩:৫৬-৫৭; ৪:৫৬, ১৭৩।

১৫ আল কুরআন ৩০:৪১।

বানাবার সুযোগ থাকবে না। সে বিচারে লবিং, চাপ সৃষ্টি, ভয় বা প্রলোভন, আপিল, জীবন ভিক্ষা ইত্যাদির কোন সুযোগ থাকবে না। আমলনামা ও মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য চিত্রের ভিত্তিতে এবং আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা বলে বিচার কার্য সমাধা হবে, এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হবে। কাজেই সেদিনের একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ্।

(৬) এর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত, দাসত্ব ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গিকার ব্যাক্ত করা হয়েছে। একটি দাস যেমন মালিকের নিকট সবকিছু সমর্পণ করে দেয়, তেমনি আল্লাহর নিকট মানুষের পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণই ইবাদতের মর্মকথা। এর মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান শিরোধার্য করে নিয়ে জীবনের প্রতি ক্ষেত্র ও পর্যায়ে তা অনুসরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন ইজমা বা মতবাদ প্রত্যাখ্যান, বর্জন ও পরিত্যাগের ঘোষণা দেওয়া হয়।

(৭) অর্থাৎ মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং অন্যের মুখাপেক্ষী, বিশেষ করে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। অপরদিকে আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি মুখাপেক্ষিতাহীন। মানুষ দুনিয়াতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, নিরাপত্তা ও উন্নত জীবনের জন্য, এবং সর্বোপরী সত্যপথের দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আয়াতের আলোচ্য অংশে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ব্যাপারেই আল্লাহর সাহায্য লাভের কামনা, বাসনা ও প্রার্থনা রয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এখানে এ শিক্ষা রয়েছে যে মানুষ কেবল মাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইবে, অন্য কারো কাছে নয়। তবে একমাত্র আল্লাহর সাহায্য কামনার সাথে দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া ও দেওয়া সাংঘর্ষিক নয়। দুনিয়াতে আল্লাহ্ কার্যকারণ (cause) এবং কার্যফল (effect) এর নিয়ম দিয়েছেন। মানুষের চেষ্টা, কর্ম ও পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া

ও দেওয়া সাংঘর্ষিক নয়। দুনিয়াতে আল্লাহ্ কার্যকারণ (cause) এবং কার্যফল (effect) এর নিয়ম দিয়েছেন। মানুষের চেষ্টা, কর্ম ও পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতা কার্যকারণের অন্তর্ভূক্ত। এসব কার্যকারণের মাধ্যমে চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্যে থাকলে সুফল পাওয়া যায়।

(৮) এখানে আল্লাহর নিকট সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সোজা পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা রয়েছে। যে পথে চলে সরাসরি জান্নাতে যাওয়া যায়, তাই হলো হিদায়াতের পথ। তা-ই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম। এরপর অন্যত্র কুরআনে বলা হয়েছে, এই গোটা কুরআনই হলো হিদায়াত বা সিরাতুল মুস্তাকীমের লিখিত দলিল, তবে তা থেকে হিদায়াত পেতে হলে ইতিবাচক মানসিকতা তথা তাক্ওয়া থাকতে হবে। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, রাসূলের আদর্শই সিরাতুল মুস্তাকীম, কারণ রাসূল (সাঃ) কুরআনী জীবন-ব্যবস্থার প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। হিদায়াত লাভের শর্ত হলো প্রচেষ্টা,[১৬] কারণ চেষ্টা না থাকলে হিদায়াতের পথের সন্ধান পেলেও সে পথে চলা সম্ভব হবে না।

(৯) অনুগ্রহ প্রাপ্তরা হচ্ছেন নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্কারগণ। তাঁরা আল্লাহর মনোনীত সিরাতুল মুস্তাকীম বা হিদায়াতের সোজা পথে চলে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন। কুরআনে তাঁদের অনেকের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো পাঠ করে সে পথের পরিচয় লাভ করতে হবে এবং সে পথে চলতে হবে। কেউ যদি সে পথ সন্ধান না করে অথবা তার সন্ধান পেয়েও সে পথে না চলে তাহলে হিদায়াত পাওয়া কঠিন। অর্থাৎ যারা নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথে চলেছেন এবং বর্তমানেও চলছেন, তাদের পথেই চলতে হবে, তাদের সঙ্গ গ্রহণ করতে হবে।

---

১৬ আল-কুরআন ২৯:৬৯।

(১০) ক্রোধে পতিত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হলো তারা, যারা সিরাতুল মুস্তাকীম বা দীন ইসলাম ও সত্যপথ ত্যাগ করে ভুল পথের যাত্রী হয় এবং মন্দ কাজ করে। অনেক তফসীরকার বলেছেন, অভিশপ্ত[১৭] বলে ইহুদী এবং পথভ্রষ্ট[১৮] বলে খ্রিষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা সত্য পথ ত্যাগ করে ভুল পথের যাত্রী। তবে ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি শুধু ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে সীমিত নয়। বরং কাফির, মুশরিক, বাতিলপন্থী ও সকল প্রকার সত্যবিমুখদের জন্যই এ দুটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।[১৯] সারকথা, যারাই কুরআন প্রদর্শিত সত্যপথ পরিত্যাগ করে বাতিলের পথে চলে তারা সবাই পথভ্রষ্ট ও আল্লাহর ক্রোধে পতিত। মানব ইতিহাসে যারা চরম মাত্রার ভ্রষ্টতায় আল্লাহর চরম ক্রোধে পতিত হয়েছে, তাদের অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমন অনেক ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর নিকট তাদের করুণ পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার দোয়ার মাধ্যমে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কুরআনে বর্ণিত এসব ইতিহাস পাঠ করা উচিত এবং সেসব বাতিল পথ পরিত্যাগ করা উচিত। বর্তমানেও যারা সে সব বাতিল পথে চলে, তাদের সঙ্গ বর্জন করা উচিত।

---

১৭ কারণ, কুরআনে ইহুদিদের জন্য গযব (অভিশাপ, ক্রোধ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন, আল-কুরআন ২:৬১।

১৮ কারণ, কুরআনে খ্রিষ্টানদের জন্য পথভ্রষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন, আল-কুরআন ৫:৭৭।

১৯ যেমন, দেখুন আল-কুরআন ১৬:১০৬; ৮:১৬; ৭:৭১; ৪:১১৪, ১৬৭; ৫:৪৭; ৩১:১১।

সূরা ফাতিহার শিক্ষা

সূরা ফাতিহায় আল্লাহ কী বলেছেন? এতে কী শিক্ষা রয়েছে?

ইসলামী জীবন-দর্শনের সকল মৌলিক বিষয়ই সূরা ফাতিহায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, সৃষ্টি ও তার প্রতিপালন, দুনিয়া ও আখিরাত, মানুষ ও স্রষ্টা, মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক, মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সত্য ও বাতিল পথ, সত্য পথ প্রাপ্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রচেষ্টাসহ ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত সূরা ফাতিহা হলো গোটা কুরআনের ভূমিকা স্বরূপ, যা কুরআনে আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিত ও ধারণা প্রদান করে। আর সমস্ত কুরআন হলো এসব আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যা এসেছে বিভিন্ন রূপে: নির্দেশ, প্রত্যাদেশ, উপদেশ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী জীবন-দর্শনের গঠনতন্ত্র জ্ঞানসমুদ্র কুরআনের ভূমিকা হিসেবে সূরা ফাতিহার কলেবর অতি ছোট। কিন্তু এর ছোট ছোট আয়াতের প্রতিটি শব্দের মধ্যে রয়েছে সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। সুতরাং এক একটি আয়াতের বিশেষণ নিয়ে এক একটি গ্রন্থ হতে পারে। কিন্তু সূরা ফাতিহার সে পর্যায়ে আলোচনা এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো সূরাটির সারমর্ম বুঝার মতো কিছুটা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা, যাতে প্রতিটি আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে। বইটির প্রথম অংশে আয়াত ভিত্তিক অধ্যায়সমূহে তা করা হয়েছে। সেখানে প্রদত্ত আলাদা আলাদা আয়াতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিক্ষার সূত্র ধরে বক্ষমান দ্বিতীয় অংশে এই সূরার প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়গুলো একত্রে উপস্থাপন করা হলো। সমন্বিতভাবে শিক্ষাগুলো অনুধাবন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যেই তা করা হলো, পূনরাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নয়। এতে করে ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো একত্রে উপলব্ধি, গ্রহণ ও অনুসরণ করাও সহজ হবে।

(১) আল্লাহতে বিশ্বাস

সূরা ফাতিহার প্রথমেই আল্লাহকে প্রতিপালক, বিচার দিনের মালিক ও সকল প্রশংসার অধিকারী ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর উপর ঈমানের ঘোষণা রয়েছে। প্রতিপালক হওয়ার মধ্যেই আল্লাহর স্রষ্টা হওয়ার ধারণা ও বিশ্বাস সুপ্ত আছে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক বিশ্বাস হলো স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহতে ঈমান। এ সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগত এমনিতে অস্তিত্বে আসেনি, বরং এর একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি হলেন আল্লাহ। তিনি সকল সৃষ্টির রব, প্রতিপালক, রাব্বুল আলামীন। কিয়ামতের শেষ বিচারের দিন তাঁরই নিকট সকল কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। গোটা সূরাটিতেই আল্লাহতে বিশ্বাসের এসব মৌলিক ধারণা ও বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রয়েছে।

আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাস জগত সম্পর্কে প্রচলিত নানা ধরনের মতবাদ ও বিশ্বাসকে নাকচ ও খণ্ডন করে। নাস্তিক্যবাদ স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। নাস্তিক্যবাদ অনুযায়ী এ গোটা সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বের পেছনে কোন স্রষ্টা, প্রভু বা বিধাতার হাত নেই, কোন মহাশক্তির পরশ নেই। সবকিছু কোন স্রষ্টা ছাড়া এমনিতেই অস্তিত্বে এসেছে। অপরদিকে কেউ কেউ কোন না কোন বিধাতায় বিশ্বাস করে। কিন্তু এ বিধাতার ধারণাও বিচিত্র। কেউ কোন জড় পদার্থ বা কোন জন্তু-জানোয়ারকে বিধাতার আসনে বসিয়ে তার উপাসনা করে। আবার উপাসনার ধরন আরো বিচিত্র। কেউ বিধাতার সন্তুষ্টির জন্য উপাসনা করে। কেউ বিধাতার জন্য খাবার পরিবেশন করে। সূরা ফাতিহার প্রথমেই আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আল্লাহকে প্রতিপালক ও বিচার দিবসের একমাত্র মালিক ঘোষণা করে নাস্তিক্যবাদ ও সকল বাতিল ধর্ম-বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। ইসলামী জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তিই হলো এই যে, এ গোটা সৃষ্টিজগতের পেছনে রয়েছেন এক মহাপ্রজ্ঞাশীল স্রষ্টা, যিনি এক মহান উদ্দেশ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

(২) আল্লাহ জগতসমূহের রব ও প্রতিপালক

আল্লাহ জগতসমূহের রব ও প্রতিপালক (আয়াত-১)। তিনি শুধু সৃষ্টিই করেন না, সৃষ্টির লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভারও তাঁর

নিজের হাতে। তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে জন্ম-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্পর্শকাতর ধাপ অতিক্রম করিয়ে একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে গড়ে তোলেন, এবং শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেন। প্রথম, তিনি কোন কিছুর জন্ম প্রক্রিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত লালন করে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি হিসেবে উন্নীত করেন।[২০] দ্বিতীয়,জন্মের পর শিশুটির দৈহিক ও মানসিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে পরিণত বয়সে পৌঁছে দেন। তৃতীয়, এরপর মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার জীবিকার ব্যবস্থা করেন। চতুর্থ, এই জগতের যেখানে যা আছে, সেখানে তা টিকে থাকার জন্য আল্লাহ যথার্থ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রেখেছেন। তা না হলে এসবের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো। উষ্ণ আবহাওয়াপূর্ণ কোন দেশের জন্তুকে উত্তর মেরুতে ছেড়ে দিলে কয়েক মিনিটেই হয়তো তা মারা যাবে, অথচ উত্তর মেরুর বরফে আবৃত এলাকায় জন্তু-জানোয়ারের গায়ের চামড়া এতো মোটা এবং দেহে এতো পুরো লোম আছে যে, বরফের হাড়কাঁপানো শীত ও ঠাণ্ডার মধ্যে তা দিব্যি জীবনযাপন করছে। পঞ্চম, সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে তার অস্তিত্ব, জীবন ও লালনের জন্য আল্লাহ ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত একটি পরিবেশ (environment) তৈরি করেছেন, যা না হলে জীবন ও অস্তিত্ব টিকে থাকতো না, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো। আমরা নিঃশ্বাসে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, গাছপালা তা ত্যাগ করে, আর আমরা যে কার্বনডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি তা গাছপালা গ্রহণ করে। গাছ যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড না নিতো, আর অক্সিজেন না দিতো, তা হলে মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতো। আল্লাহর প্রতিপালনের কি অপরূপ ব্যবস্থা!

এখানে আরও দুটি বিষয় বিবেচ্য । প্রথম, রবুবিয়্যত ও প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষকে জীবিকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। যার যা রিযক সে তা পাবেই, যদিও তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু অতি চেষ্টার মাধ্যমে বা অবৈধ উপায় অবলম্বন করে নির্ধারিত রিযকের চেয়ে অতিরিক্ত পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং জীবিকা অন্বেষণ বা অধিক

---

২০ যেমন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্পর্শকাতর পর্যায় অতিক্রম করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু রূপলাভ করে। অতি সামান্য কিছুতেই তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গর্ভধারিণী মা বুঝতেও পারছেন না তার গর্ভে কি হচ্ছে। তিনি দিব্যি চলাফেরা করছেন। আল্লাহ সযত্নে শিশুটির সুরক্ষা করছেন।

উপার্জনের জন্য অসদুপায় অবলম্বন এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়, আল্লাহর রবুবিয়্যতের নিয়ম হলো এই যে, সৃষ্টির জন্য যা উপযুক্ত, সেভাবেই তিনি সবকিছু প্রতিপালনের ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্মশক্তি দিয়ে জীবিকা অন্বেষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যথাযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করা মানুষের কর্তব্য।

(৩) আল্লাহ পরম করুণাময়

আল্লাহ হলেন পরম করুণা ও দয়ার আধার (আয়াত-২)। তিনি করুণাকে তাঁর জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছেন। তাঁর করুণা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আল্লাহর দয়া ও করুণার চিহ্ন প্রতিটি মানুষের সৃষ্টি থেকে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রথম, মানুষের সযত্ন সৃষ্টি, লালন-পালন ও প্রতিপালনসহ সকল ক্ষেত্রেই সে দয়া ও করুণার স্বাক্ষর রয়েছে। দ্বিতীয়, মানুষকে শুধু ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েই আল্লাহ ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি হিদায়াতের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব দিয়েছেন। তা না হলে মানুষ নিজ স্বল্প জ্ঞানে সত্যপথ খুঁজে নিতে পারতো না। তৃতীয়, হিদায়াতের এ কার্যকরী ব্যবস্থা সত্ত্বেও মানুষের পদস্খলন হয়, মানুষ আল্লাহর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে ফেলে; কিন্তু মানুষ যতোই অপরাধ করুক, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন (তওবা) করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেন।[২১] চতুর্থ, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, এবং যারা আল্লাহ ও আল্লাহর দীনের দুশমন ও শত্রু, তাদেরকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছেন না, বরং তাদেরকেও দুনিয়ার জীবনে জীবিকার উপকরণাদি দিয়ে যাচ্ছেন।[২২] পঞ্চম, মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিনও মানুষের সাথে আল্লাহর আচরণ হবে পরম করুণার। আল্লাহতে ঈমান আনার পরও যারা খারাপ কাজ করে, তাদের অনেককেই সেদিন তিনি নানা উসিলায় ক্ষমা করে

২১ আল-কুরআন ৬:১২।

২২ আল-কুরআন ৬:৫৪।

দেবেন। যাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে বড়জোর খারাপ কাজের সমপরিমাণ শাস্তি দেবেন, একটুও বেশি নয়। কিন্তু যারা ভালো কাজ করে, তাদেরকে দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বেশি পুরস্কার দেবেন। পুরস্কারের আধিক্য নির্ভর করবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, নিষ্ঠা এবং একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করা ইত্যাদি মাপকাঠির উপর। নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রমাণ ও নিদর্শন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ যখন এতো করুণাময়, তখন দুনিয়াতে এতো কষ্ট কেন? আর আখিরাতেও কেন শাস্তি থাকবে? একটু চিন্তা করলে এর জবাব পাওয়া কঠিন হবে না। পিতা-মাতা যেমন সন্তানের মঙ্গলের জন্যই শাসন করেন, তেমনি অনেক সময় আল্লাহ বান্দাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যই দুনিয়াতে বিপদ দ্বারা সতর্ক করেন।[২৩] কখনো আবার মন্দ কাজের জন্য দুনিয়ার সামান্য শাস্তি দেন।[২৪] অনেক সময় আল্লাহ দুনিয়াতে অল্প কষ্ট দিয়ে তাঁর প্রিয় বান্দাকে আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করেন। কখনো আবার আল্লাহর প্রিয় বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটু বিপদ ও কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করেন। নিঃসন্দেহে এটাও আল্লাহর করুণা।

এ তো গেলো দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদের কথা। আখিরাতের ব্যাপারটিও সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহ ও আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামের পক্ষের ও বিপক্ষের মানুষকে যদি একই সাথে পরম শান্তির জান্নাতে স্থান দেওয়া হয়, তা কি ইনসাফ হবে? যারা আল্লাহর দীনের জন্য চরম নির্যাতন সহ্য করতে করতে প্রাণ দেয়, তা হবে তাদের প্রতি চরম নির্দয় আচরণ। সুতরাং করুণা ও দয়ার দাবি হলো ভালো মানুষকে শান্তির জান্নাতে স্থান দেওয়া, আর পাপিষ্ঠদেরকে শাস্তি দেওয়া। আখিরাতের এ শাস্তির ব্যবস্থাও আল্লাহর করুণাময় হওয়ারই প্রমাণ।

---

২৩ আল্লাহ বলেনঃ "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে (আল্লাহ) তাদের কোন কোন অসৎ কর্মের শাস্তি ভোগ করান, যাতে তারা সুপথে ফিরে আসে।" আল কুরআন ৩০:৪১।

২৪ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট ও বিপদ মানুষের কর্মের ফলেই আসে, আল কুরআন ৩০:৪১।

(৪) সকল প্রশংসা করুণাময় আল্লাহর প্রাপ্য

সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র এমন করুণাময় আল্লাহরই প্রাপ্য (আয়াত-১), যার কিছুটা পরিচয় উপরে তুলে ধরা হলো। যিনি এমন দয়া ও করুণার মালিক, সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই সকল নিয়ামত ও ভালো-মন্দের স্রষ্টা ও দাতা। সে দান প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, তা আল্লাহরই দান। যেমন, রৌদ্রের দরুন যদি কারো গরম লাগে, বাহ্যত তার কারণ হলো সূর্য। কিন্তু সে সূর্যের স্রষ্টাও আল্লাহ। মানুষ প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অগণিত নিয়ামতরাজিতে ডুবে আছে। সে নিয়ামত একমাত্র আল্লাহর দান। কোন সুন্দর তৈলচিত্রের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যদি তার প্রশংসা করা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে প্রশংসা করা হয় চিত্রশিল্পীর। একইভাবে কোন ভালো জিনিসের বা ভালো কাজের যদি প্রশংসা করা হয়, তা হলে সে প্রশংসার কেন্দ্র বিন্দুও আল্লাহ। কারণ এ সকল কাজ ও কার্যকারণের উৎস হলেন আল্লাহ। কাজেই প্রশংসা যা আছে, তার সবটুকুই আল্লাহর প্রাপ্য। তাই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। প্রশংসা শুধু প্রাপ্ত নিয়ামতের শুকরিয়ার জন্য নয়, বরং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সে নিয়ামত প্রাপ্ত হোক বা না হোক, অন্যরা তা পাচ্ছে, সমস্ত সৃষ্টি জগতই তা পাচ্ছে। সেহেতু আল্লাহর প্রতিটি মহান দান ও মহিমার জন্য সর্বত্র সর্বকালে একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য সকল প্রশংসা।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় দুনিয়ার সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আর অপরদিকে উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতিও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ কৃতজ্ঞা তো প্রশংসারই নামান্তর। অর্থাৎ একদিকে মানুষের প্রশংসা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, অন্যদিকে এখানে সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আপাতদৃষ্টিতে দুটো বক্তব্য সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। আসলে তা সাংঘর্ষিক নয়। সব কিছুর কার্যকারণ হিসেবে প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। কোন মানুষ যদি অন্য কাউকে কোন সাহায্য সহযোগিতা করে অথবা উপকার করে, সে উপকার বা প্রাপ্ত জিনিসের

স্রষ্টাও আল্লাহই। যে ব্যক্তি তা প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছে তার সাহায্যের ক্ষমতাও আল্লাহরই দান এবং অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতাও আল্লাহর ইচ্ছায়-ই হয়। এভাবে সবকিছুর কার্যকারণ হলেন আল্লাহ, সুতরাং প্রকৃত প্রশসংসা তাঁরই প্রাপ্য। তবে যে ব্যাক্তি সাহায্যের মানসিকতা সহকারে অন্যের উপকার করে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কোন কিছু প্রাপ্তির আসল কার্যকারণ হিসেবে প্রকৃত প্রশংসা একান্তভাবে আল্লাহরই প্রাপ্য, তবে সে প্রাপ্তির বাহ্যিক সহায়ক হিসেবে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই মানবতা সুলভ আচরণ। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, সে আসলে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না।[২৫] সুতরাং, যে কোন নিয়ামতের বেলায় আল্লাহর দান হিসেবে মনের গভীরে প্রথম কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা থাকা উচিত আল্লাহর। এরপর কৃতজ্ঞতা থাকবে তার, যার মাধ্যমে আল্লাহর এ নিয়ামত পাওয়া গেলো।

সারকথা, আল্লাহ হলেন দয়া ও করুণার সাগর। সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। সে প্রশংসাসুলভ কৃতজ্ঞতা কাম্য।

(৫) আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উপায়

সবকিছুর সযত্ন সৃষ্টি ও প্রতিপালন এবং গোটা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অপার দয়া ও করুণার দাবী হলো এর স্বীকৃতিসহ আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। কিন্তু তার উপায় কি? সংক্ষেপে এর উপায় হলো নিম্নরূপ। প্রথম, স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে যে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা। দ্বিতীয়, আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান শিরোধার্য করে নেওয়া। তৃতীয়, গোটা জীবন সে অনুযায়ী পরিচালিত করা। আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার এ সারমর্ম আরো পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে 'ইয়্যাকা না'বুদু' প্রত্যয়ের মাধ্যমে, এবং হিদায়াত প্রার্থনার মাধ্যমে, যে হিদায়াত দেওয়া হয়েছে কুরআন ও রাসূলের আদর্শরূপে।

---

২৫ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।" তিরমিযী, হাদিস নং ১৯৫৫।

তবে যার অন্তরের গভীরে কৃতজ্ঞতা থাকে, তার মুখ থেকেও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি বেরিয়ে আসে। 'আল-হামদুলিল্লাহ' দ্বারা সূরা ফাতিহা শুরু করে সে শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অন্তরের অন্তস্থলে থাকবে দৃঢ় বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও সর্বত্র তার প্রতিফলন। মানুষ এ দায়িত্ব কিভাবে কতোটুকু পালন করলো তার জন্য আছে জবাবদিহি, আখিরাতে।

(৬) আখিরাতে বিশ্বাস

আল্লাহ হলেন বিচার দিনের মালিক (আয়াত-৩)। তিনি গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এ সৃষ্টি অনর্থক নয়, বরং এর একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে মানুষ ও জিন জাতির উপর।[২৬] মানুষ ও জিন সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্রত হয়েছে কিনা, বা কতটুকু হয়েছে, এবং কিভাবে তাদের জীবন কাটিয়েছে, তার বিচার হবে কিয়ামতের দিন। সেদিন সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। সে বিচার দিনের মালিক হলেন আল্লাহ। বিচারের প্রকৃত মর্ম হলো ভালো কর্ম দ্বারা নাজাত পেয়ে জান্নাত লাভ করা, আর মন্দ কর্মের জন্য শাস্তি পাওয়া। সে শাস্তির স্থান হলো জাহান্নাম। মূল কথা, এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, বরং দুনিয়ার পর আখিরাতে অনন্তকালের জীবন রয়েছে।

এ বিশ্বাসটি হলো ইসলামী জীবন-দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কোন স্রষ্টা ছাড়া এ জগতের অস্তিত্ব যদি এমনিতেই হয়ে থাকতো, তা হলে এ জীবনেই আমাদের শেষ হতো। এরপর আর কিছু থাকার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু ইসলামী জীবন-দর্শনের ভিত্তি হলো এই যে, একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু এ জীবনের শেষে দুনিয়ার কর্মফল ভোগ করার জন্য আখিরাতের অস্তিত্ব একটা

---

২৬ এ মহাসৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে ইয়্যাকা না'বুদু-এর আওতায় বর্ণিত হয়েছে (নীচে অষ্টম শিক্ষা দ্রষ্টব্য)।

যৌক্তিক প্রয়োজন। কর্মফল নির্ধারণের জন্য আখিরাতের শুরুতে কিয়ামতের দিন বসবে বিচারের এজলাস এবং সে বিচারের রায় অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করতে হবে অনন্তকালের জীবনে। আল্লাহ বিচার দিনের মালিক, এ ঘোষণার মাধ্যমে আখিরাতের উপর এমন বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে।

এ জগত হলো আখিরাতের কর্মক্ষেত্র ও শস্যক্ষেত্র। এখানে যেমন কর্ম হবে, যেমন ফসল উৎপাদন করতে পারবে, আখিরাতে সেরূপ জীবনই লাভ হবে, সেরূপ ফলই পাওয়া যাবে। এ বিশ্বাসের দাবি হলো এই যে, মানুষ দুনিয়ার জীবনকে সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে না। বরং দুনিয়াতে উত্তম জীবন যাপনের সাথে সাথে আখিরাতের অনন্তকালের জীবনকেই প্রধান উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে। আর এমনভাবে জীবন চালাবে, এমন কাজ করবে, যা আখিরাতে কল্যাণ নিয়ে আসে। কোন প্রকারেই আখিরাতের অনন্তকালের কল্যাণকে বিসর্জন দিয়ে সে দুনিয়ার ক্ষণিকের আনন্দ ও সুখ বেছে নেবে না। দুনিয়াকে বাদ দিয়ে আখিরাত নয়, এবং আখিরাতের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য নেই। দুনিয়ার কল্যাণ কাম্য, তবে প্রাধান্য হলো আখিরাতের। কারণ, দুনিয়ার শেষ আছে, আখিরাতের শেষ নেই।

(৭) আল্লাহ বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি

আল্লাহ হলেন বিচার দিনের মালিক (আয়াত-৩)। এখানে আখিরাতে বিশ্বাসের সাথে সাথে আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো এই যে, আল্লাহ হলেন বিচার দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। কিয়ামতের বিচারের বেলায় কোন যুক্তিতর্ক, প্রভাব, লবিং বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চাপ বা সুপারিশ চলবে না, আপিল চলবে না, উর্ধতন কোন কর্তৃপক্ষের নিকট জীবন ভিক্ষার আবেদন চলবে না। আল্লাহর বিচারে কোন অসন্তোষ প্রকাশ, তা অমান্য করা, বা রায় প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ বা ক্ষমতা কারো থাকবে না। দুনিয়াতে বিচারককে নিজের পক্ষে ঘুরাতে সক্ষম হয়ে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিরা জঘন্য অপরাধ করেও

আইনের হাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু আখিরাতে সে সুযোগ থাকবে না।

কিয়ামতের বিচার ও দুনিয়ার বিচারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথম, কিয়ামতের দিন আল্লাহ হলেন একমাত্র বিচারক। তাঁর কোন সাহায্যকারী, সহযোগী বা পরামর্শদাতা থাকবে না। দ্বিতীয়, সেদিনের বিচারে কোন যুক্তিতর্কের অবকাশ থাকবে না। সেদিনের কোর্টে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ দাঁড় করিয়ে আল্লাহর বিচার কার্য ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার কোন সুযোগ থাকবে না। সেদিন সাক্ষী হবে ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা এবং মানুষের কর্মের সচিত্র প্রমাণ (documentary film) বা প্রামাণ্য সাক্ষী (documentary evidence)। তৃতীয়, সেদিনের বিচারে কোন প্রভাব, চাপ, ভয়, প্রলোভন বা সুপারিশের অবকাশ থাকবে না। চতুর্থ, সেদিনের বিচারে কারো কোন অসন্তোষ প্রকাশ করা, বা বিচারের রায় অমান্য করার মতো কারো কোন ক্ষমতা থাকবে না। পঞ্চম, সেদিন আল্লাহর বিচারই হবে চূড়ান্ত, এবং সেখানে আপিলের কোন সুযোগ থাকবে না। ষষ্ঠ, সেদিন আল্লাহর রায়ের উপরে জীবন ভিক্ষা দেওয়ার অন্য কোন কর্তৃপক্ষ থাকবে না। কাজেই সেদিন আল্লাহ হবেন একচ্ছত্র বিচারক, তাঁর রায় হবে অকাট্য এবং অবশ্যপালনীয়। আল্লাহ হলেন বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি।

আসলে আল্লাহ হলেন গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা, প্রতিপালক, মালিক ও অধিপতি। এখন প্রশ্ন, আল্লাহ যদি সবকিছুর মালিক ও অধিপতি হন, তা হলে আলোচ্য আয়াতে তাঁকে শুধু বিচার দিনের মালিক বলার অর্থ কি? এর জবাব হলো এই যে, আল্লাহ দুনিয়াসহ গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা, প্রতিপালক ও অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি দুনিয়াতে মানুষকে কিছু শক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তা সুপথে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ শক্তি ও ক্ষমতা বলেই মানুষ দেশ চালায়, শাসন করে এবং দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য আইন-কানুন বানাতে পারে। এমন অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর দীন এবং মুসলমানদের বিরোধী হয়েও দুনিয়াতে ক্ষমতার দাপট দেখায়। আল্লাহ তাদের দাপট বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবন

পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। এভাবে আল্লাহর আনুগত্যে হোক বা বিরোধিতায়ই হোক, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারাই আল্লাহর বৃহত্তর রাজত্বের আওতায় দুনিয়াতে ক্ষুদ্র পরিসরে মানুষের রূপক রাজত্ব চলে। কিন্তু সে ক্ষমতার দৌড় দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তা আখিরাতে চলবে না। দুনিয়াতে যে যতো শক্তিশালী, ক্ষমতাবান ও দাপটওয়ালাই হোক, কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া টু শব্দটি করার অবস্থা থাকবে না। সেদিনের একচ্ছত্র অধিপতি হবেন আল্লাহ। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত এমনভাবে জীবন যাপন করা যেনো সে দিনের বিচারের রায় তার পক্ষে যায়।

(৮) সৃষ্টি ও জীবনের উদ্দেশ্য : আল্লাহর ইবাদত

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে, সে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে (আয়াত-৪)। এখানে মানব-সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরেশতাসহ এমন কিছু সৃষ্টি আছে, যা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে নিমগ্ন আছে। কিন্তু তাতে তো আল্লাহর রাজত্বের পুরো প্রকাশ পায় না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন সৃষ্টি যারা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতকে শিরোধার্য করে নিয়ে আল্লাহতে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মসমর্পণ করে দেবে। এ মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ সৃষ্টি করেন মানুষ ও জিন জাতিকে। তাদের সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ বলেন, "আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[২৭] অর্থাৎ ইবাদত ছাড়া জিন ও মানুষ সৃষ্টির আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এ ইবাদতের সারমর্ম হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য তথা আল্লাহর দেওয়া আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মা'বুদ ও বান্দার, প্রভু ও

---

২৭ আল-কুরআন ৫১:৫৬।

দাসের। সম্পর্ক হলো ইবাদত ও দাসত্বের। এ দাসত্ব ও ইবাদত একান্তভাবে আল্লাহর জন্য। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা, রব, প্রতিপালক, মা'বুদ; আর মানুষ হলো 'আবদ' বা বান্দা, দাস। একটি দাসের কাজ যেমন একমাত্র মনিবের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা, তেমনি মানুষের কাজ হলো একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা তথা আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁরই দাসত্ব করা, তাঁরই আনুগত্য করা, তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। তাঁর আদেশ মান্য করা, পালন করা এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে আত্মরক্ষা করা। এটাই ইবাদতের অর্থ ও তাৎপর্য। এটাই মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইবাদত ও আনুগত্য হতে হবে পূর্ণাঙ্গ। একটা দাসের জন্য মনিবের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য বাধ্যতামূলক। মনিবের কিছু নির্দেশ মান্য করে এবং কিছু প্রত্যাখ্যান করে দাসত্বের সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব। ঠিক তেমনি শুধু নামায-রোযা ও বিয়েশাদী সংক্রান্ত এবং ব্যক্তি জীবন সংশিষ্ট কয়েকটি বিধি-নিষেধ মান্য করে কেউ আল্লাহর অনুগত বান্দা থাকতে পারে না। আল্লাহর ইবাদতের দাবি হলো প্রভু হিসেবে আল্লাহর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে তার বাস্তবায়ন করা। নামায-রোযা ও সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতসহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যারা কুরআন প্রদত্ত গোটা জীবন-ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ঈমান আনো।"[২৮] তাদেরকে আল্লাহ ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন, যেনো তারা ঈমানই আনেনি। তাদেরকে ইসলামের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে দাখিল হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২৯] এক কথায়, আল্লাহর ইবাদতের দাবি হলো আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করা এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন করা।

---

২৮ আল-কুরআন ৪:১৩৬।

২৯ আল-কুরআন ২:২০৮।

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তথা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া আল্লাহর ইবাদত বা দাসত্ব পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আল্লাহর এরূপ ইবাদতই মানুষের করণীয়।

(৯) ইবাদতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইবাদতের জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এই ইবাদত না করতে পারলে মানব জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। তবে এ প্রেক্ষিতে একটা দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। সহজ ভাষায় প্রশ্নটি হলো,এ ইবাদতের উদ্দেশ্য কি? ইবাদত থেকে কাম্য কি?

আসলে ইবাদতের অনেক উদ্দেশ্য চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথম, আল্লাহই স্রষ্টা ও প্রতিপালক, সুতরাং ইবাদত তাঁরই প্রাপ্য। দ্বিতীয়, আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর ইবাদত করতে হবে। তৃতীয়, ইবাদত হলো আল্লাহর নির্দেশ, যে জন্য মানুষের সৃষ্টি, কাজেই তাঁর ইবাদত করা প্রয়োজন। চতুর্থ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ এবং জান্নাত পাওয়ার জন্য ইবাদত দরকার। পঞ্চম, আল্লাহর ইবাদত করতে হবে তাঁকে ভালোবেসে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য, কোনো বিনিময়ের জন্য নয়।

ইবাদতের এসব উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কারো কারো মতে উপরে উল্লেখিত পঞ্চম উদ্দেশ্যটি অজর্নই ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহকেই পাওয়া। আল্লাহর নিয়ামত ও করুণার শুকরিয়া স্বরূপ ইবাদত নয়, কারণ এতসব নিয়ামতের যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অসম্ভব। আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যও ইবাদত নয়, বরং নির্দেশ পালনের চেয়ে ইবাদতে আরো বেশি স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত। আবার ইবাদত জাহান্নামের ভয়ে বা জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যেও নয়। ভয়ে বা লোভে আল্লাহর ইবাদত করা তো স্বার্থপরতা। সুতরাং ইবাদত করা প্রয়োজন আল্লাহকে ভালোবেসে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, অন্য কিছুর

উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহকে ভালোবেসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে যদি আল্লাহকে পাওয়া যায়, তা হলে তো সবই পাওয়া হলো।

কিন্তু প্রতিটি মানুষের পক্ষে এরূপ আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থা অর্জন করা কঠিন। এরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা কাম্য হতে পারে, অবশ্যকর্তব্য নয়। এজন্যই কুরআনে তাগিদ করা হয়েছে ভয় ও আশা (خَوْفاً وَطَمَعاً) সহকারে আল্লাহকে ডাকার জন্য।[৩০] সুতরাং আল্লাহকে ডাকা এবং তাঁর ইবাদত করা উচিত তাঁকে ভালেবেসে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়, যার সাথে থাকবে আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং ক্ষমা ও মুক্তির আশা। মূল কথা, ইবাদতের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়, বরং মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সন্তুষ্টি। এ অর্থেই মুসলমানদের সকল ইবাদতেরর উদ্দেশ্য হলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। "বলো, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একান্তভাবে আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।"[৩১]

(১০) তাওহীদ বা একত্ববাদ

'ইয়্যাকা না'বুদু' বলে এ বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত করিনা (আয়াত-৪)। এর পূর্বের বর্ণিত তিনটি আয়াতে নাস্তিকতা নাকচ করে আস্তিকতা তথা আল্লাহর অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, আর সাথে সাথে স্রষ্টা আল্লাহর রুবুবিয়্যত, বিচার দিনের একমাত্র মালিক এবং সকল প্রশংসার অধিকারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে তাওহীদ ও একত্ববাদের বিশ্বাসও অন্তনির্হিত আছে।

এরপর চতুর্থ আয়াতে একান্তভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করার অঙ্গীকার এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে আরো প্রত্যক্ষভাবে তৌহিদ বিশ্বাসের অবতারণা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা করানো

---

৩০ আল-কুরআন ৭:৫৬; ৩২:১৬।

৩১ আল-কুরআন ৬:১৬২।

হয়েছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করিনা, বরং একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, অন্য কোন উপাস্য নেই। ইবাদত হলো একমাত্র আল্লাহর, কারণ তিনি একা ও একক, একমাত্র তিনিই স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এ বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ আরো স্পষ্টভাবে বলেন, "আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ (মা'বুদ বা উপাস্য) নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো।"[৩২] "আর তারা এক ইলাহ (মা'বুদ বা উপাস্য)-এর ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে (তাঁর সাথে অংশীদার হিসেবে) শরিক বানায়, তা থেকে তিনি কতো পবিত্র!"[৩৩]

সূরা ফাতিহায় "ইয়্যাকা না'বুদু" বলে বলিষ্ঠভাবে তাওহীদ ও একত্ববাদের এ ঘোষণাই দেওয়া হচ্ছে। ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হবে না। ইবাদত করতে হবে একান্তভাবে আল্লাহর, অন্য কারো নয়। ইবাদত যদি একান্তভাবে আল্লাহর জন্য না হয়, বরং তাতে অন্যকে শরিক করা হয়, তবে তা হবে শিরক। শিরক অমার্জনীয় অপরাধ।[৩৪] শিরক দুই প্রকারঃ আকীদার শিরক এবং আমলের শিরক। আকীদার শিরক হলো একাধিক উপাস্য মান্য করা এবং উপাসনায় আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা। যেমন, খ্রিষ্টানরা ট্রিনিটি বা তিন উপাস্যে বিশ্বাস করে।[৩৫] আর আমলের শিরক হলো আল্লাহর আনুগত্যের সাথে অন্যেরও আনুগত্য করা, যা আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। কর্মকাণ্ডে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা, আল্লাহকে উপাস্য স্বীকার করার পরও আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে অন্যের বিধান মেনে নেয়া; আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক মানব-রচিত জীবন-বিধান মান্য করা এবং সেমতে ব্যক্তি ও

---

৩২ আল-কুরআন ২০:১৪।

৩৩ আল-কুরআন ৯:৩১।

৩৪ আল-কুরআন ৪:৪৮।

৩৫ আল-কুরআন ৫:৭৩।

পারিবারিক জীবন এবং সমাজ চালানো, ইত্যাদি। অর্থাৎ এক আল্লাহতে বিশ্বাস সত্ত্বেও বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা। আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহ বিরোধী, আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন মতবাদ, ইজম বা বিধান মান্য করা যাবে না। কারণ, এর দ্বারা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরিক করা হবে, আর প্রকারান্তরে আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে। এ মর্মেই আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত (আদর্শ) অনুযায়ী বিধান দেয়না, তারাই কাফির।"[৩৬] অন্যত্র আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনকারীকে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্য বিধান অনুসরণকারীকে যালেম ও ফাসেক বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৩৭] এখানে উল্লেখ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এমন কোন বিবি-বিধান ও আইন রচনা এবং তার বাস্তবায়নে কোন বাধা নেই যা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থেই প্রায়োগিক বিধি-বিধান প্রয়োজন।

(১১) মানুষের স্বাধীনতা

"আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি", এই ঘোষণায় এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ হলো স্বাধীন, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট মাথা নত করবে না। কোন মানুষ, কোন সৃষ্টি, বা কোন সাংঘর্ষিক মতবাদের প্রতি মানুষের কোন আনুগত্য নেই। মানুষের শির চির উন্নত ও স্বাধীন। সে মাথা নত করবে একমাত্র আল্লাহর নিকট, অন্য কারো নিকট নয়। সাধারণত মানুষ তিনভাবে অন্য মানুষ বা মানব স্বার্থ বিরোধী অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং আনুগত্যের শিকার হয়। প্রথম, ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে কখনো কখনো মানুষ অন্য মানুষকে পূজনীয় আসনে বসিয়ে আনুগত্যের শিকলে বন্দী হয়ে যায়। যেমন, কোনো কোনো ধর্মে ধর্মযাজকদের প্রতি পূজনীয় পর্যায়ের আনুগত্য। দ্বিতীয়, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ এবং স্বৈরতন্ত্রী শাসকরাও অনেক সময় সাধারণ মানুষের

---

৩৬ আল-কুরআন ৫:৪৪।

৩৭ আল-কুরআন ৫:৪৫, ৪৭।

স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। তৃতীয়, কখনো কখনো মানুষ ভ্রষ্টতার আবর্তে মানবরচিত কোন সাংঘর্ষিক মতবাদ অথবা বাতিল ধর্ম-বিশ্বাসে এমনভাবে দীক্ষিত হয়ে পড়ে যে, সে তার স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি হারিয়ে বসে।

আল্লাহর কোন সৃষ্টি বা মানব-রচিত মতবাদের এরূপ অধীনতা ও আনুগত্য থেকে মানুষের মুক্তির কথা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কুরআনের তিনটি উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে। (১) "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত-পুরোহিত-পাদ্রী ও সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীদেরকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকেও। অথচ তারা এক মা'বুদের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল।"[৩৮] (২) "আইন ও বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন তোমরা যেনো তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত না করো।"[৩৯] (৩) "নিঃসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন (জীবন-ব্যবস্থা)।"[৪০]

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ মানুষকে মানব-পূজা থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, কেননা মানব স্বার্থ বিরোধী আইন রচনার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। তৃতীয় আয়াতে ইসলাম ছাড়া অন্য সকল বাতিল ধর্ম-বিশ্বাস থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এভাবে সূরা ফাতিহার চতুর্থ আয়াতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের ঘোষণার মধ্যে সকল সৃষ্টির দাসত্ব ও অধীনতা থেকে মানুষের মুক্তির যে পয়গাম রয়েছে, যা অন্যত্র আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টির গোলামী ও অধীনতা থেকে মুক্ত, স্বাধীন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ দেশের

---

৩৮ আল-কুরআন ৯:৩১।

৩৯ আল-কুরআন ১২:৪০।

৪০ আল-কুরআন ৩:১৯।

আইন-শৃঙ্খলা মান্য করবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলার বিধি-বিধান আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধানের সামগ্রিক ও নৈতিক কাঠামোর আওতায় থাকে, সে বিধি-বিধান মেনে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে, কারণ তা আল্লাহর বিধানেরই ছায়া স্বরূপ।

(১২) ইবাদতের সামষ্টিকতা ও সামষ্টিক জীবনের গুরুত্ব

"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি' (আয়াত-৪) বাক্যটির বাচনভঙ্গি লক্ষ্যণীয়। এখানে "আমি" এর পরিবর্তে "আমরা" অর্থাৎ একবচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও পাঠক একাই সূরা ফাতিহা পাঠ করে। একবচনে বলা যেতো "আমি একমাত্র তোমারই ইবাদত করি।" তা না করে এখানে একবচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি"। এভাবে এখানে ইবাদতের সামষ্টিকতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সামষ্টিকভাবে আল্লাহর নিকট ইবাদতের অঙ্গিকার প্রদান করা এবং একাকী নামায না পড়ে জামাআতে সামষ্টিকভাবে নামায পড়ার মধ্যে ইবাদতের সামষ্টিকতা প্রকাশিত হয়। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই, এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যেও সে ভ্রাতৃত্ব ও সামষ্টিকতার প্রতিফলন রয়েছে। আসলে ইসলামী জীবনাদর্শ আদর্শিক ও জাগতিক সকল ব্যাপারেই জাতীয় ঐক্য ও সামষ্টিকতার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৪১]

(১৩) মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অমুখাপেক্ষী নয় : দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে সাহায্য প্রয়োজন

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় অংশ হলো 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' (আমরা শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। এ প্রার্থনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং এ দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অমুখাপেক্ষী নয়, বরং সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর সে কারণেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

---

৪১ আল-কুরআন ৩:১০৩।

দুনিয়া ও আখিরাত, পার্থিব কর্মকাণ্ড ও ইবাদত, সকল ব্যাপারেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

শরীর ও মন, দুদিক দিয়েই মানুষ দুর্বল। শারীরিক দিক দিয়ে মানবদেহে কোন কোন জীবজন্তুর সমান শক্তিও নেই। বুদ্ধিবৃত্তিক মাপকাঠিতে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের জ্ঞান অধিক থাকলেও আল্লাহর জ্ঞান-প্রজ্ঞার তুলনায় তা অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। অপরদিকে সকল শক্তির উৎস ও আধার হলেন আল্লাহ। তিনি মুখাপেক্ষিতাহীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।৪২

সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রয়োজন সত্যপথ পাওয়ার জন্য। মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাহায্যে সত্য, সঠিক, সোজা পথের হিদায়াত পাওয়া কঠিন। সত্যপথ পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা থাকতে হবে বটে, তবে সে প্রচেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকলে হিদায়াত পাওয়া সহজ হয়।

সত্যপথ পাওয়ার পর তা অনুসরণের জন্যও আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। অন্যায় ও নিষিদ্ধ জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়। অন্যায় অশীল ও গর্হিত কাজ আকর্ষনীয় হয়। প্রবৃত্তি মানুষকে সেদিকে টানে। সমাজের কলুষিত অংশও সেদিকে আকর্ষণ করে। শয়তানও সেদিকে প্ররোচিত করে। প্রবৃত্তি, শয়তান ও পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করে প্রবৃত্তির কামন-বাসনা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি, মযবুত ঈমান ও দৃঢ় মানসিক শক্তির প্রয়োজন। সেজন্য প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো খুব সহজ নয়। ভোরবেলার মধুর নিদ্রা ত্যাগ করে ফজর নামায আদায় করা, প্রত্যেক দিনের পাঁচটি নির্দিষ্ট সময় সকল কর্মকাণ্ড, ব্যস্ততা ও আনন্দফূর্তি ছেড়ে নামাযে উপস্থিত হওয়া আল্লাহ-ভীরু লোকদের ছাড়া সত্যিই কঠিন।৪২ রমযানে দীর্ঘ এক মাস ধরে রোযা রাখা, কষ্টার্জিত ধন

---

৪২ দেখুন আল-কুরআন ৩৫:১৫; ৪৭:৩৮।

৪৩ আল-কুরআন ২:৪৫।

বিনা স্বার্থে অন্যকে দিয়ে দেওয়া (যাকাত) ইত্যাদি ইবাদতগুলোও সহজ নয়। এসব ইবাদত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বলিষ্ঠ ঈমান ও মনোবল প্রয়োজন। মানুষের চেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকলে তা সহজ হয়ে যায়।

আনুষ্ঠানিক ইবাদতকে গুণ ও মানগত দিক দিয়ে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তার পূর্ণ ফায়দা পাওয়াও সহজ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে কোন ভালো কাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত দেওয়া হয়। তা নির্ভর করে ইবাদতে নিষ্ঠার উপর, আর কতোটুকু সুন্দর ও নিখুঁতভাবে তা করা হলো তার উপর। ইবাদত হওয়া উচিত পূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে, একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মানুষের চেষ্টার সাথে যদি আল্লাহর সাহায্য থাকে, তা হলে প্রতিটি ইবাদতকে এমন নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে এবং কাঙ্ক্ষিত মানে সম্পন্ন করা সম্ভব।

দুনিয়ার কর্মকাণ্ড ও সাফল্য অর্জনের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক নীতি হলো এই যে, কার্যকারণ (causes) অনুযায়ী কার্যফল (effects / results) পাওয়া যায়। চেষ্টার মাধ্যমেই সবকিছু অর্জন করতে হয়।[৪৪] কিন্তু শুধু চেষ্টা দ্বারা সবসময় সবকিছু পাওয়া যায় না। এমনও দেখা যায় যে, অনেক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিও তেমন পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয় না, যদিও তাদের চেষ্টা তদবীরে কোন ত্রুটি থাকে না। অন্যদিকে অল্প জ্ঞানসম্পন্ন অনেকে অল্প চেষ্টাতেই বিরাট সাফল্যের অধিকারী হয়ে যায়। মানুষের চেষ্টার সাথে যদি আল্লাহর সাহায্য থাকে, তা হলে দুনিয়ার সাফল্য সহজেই অর্জিত হতে পারে। আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়ার রাজত্ব দেওয়া নেওয়া আল্লাহরই কাজ।[৪৫]

অতএব দঁড়ালো এই যে, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অমুখাপেক্ষী নয়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে অর্জন ও সাফল্যের জন্য 'চেষ্টা' হলো 'যরূরী শর্ত' (necessary condition), কোনমতেই তা 'যথেষ্ট শর্ত'

৪৪ আল-কুরআন ৫৩:৩৯।

৪৫ আল-কুরআন ৩:২৬।

(sufficient condition) নয়। 'যথেষ্ট শর্ত' হলো আল্লাহর সাহায্য। কাজেই সকল ব্যাপারেই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

(১৪) সাহায্যের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ : কেবল মাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা

"ইয়্যাকা নাস্তাঈন" দ্বারা বুঝা যায়, মানুষের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন, যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ বক্তব্যের আরেকটি দিক হলো এই যে, শুধু আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে, অন্য কারো নিকট নয়। কেননা, ভালো-মন্দ সহায়-সম্পদ সবকিছুর স্রষ্টা ও দাতা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছা ব্যাতীত কেউ কোন কিছু পেতে পারে না, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কারো কোন বিপদ আসতে পারে না, বিপদ দূরও হতে পারে না। পাওয়া না পাওয়া সবই আল্লাহর ইচ্ছায়। সুতরাং কোন কিছু প্রার্থনা করতে হলে তাঁরই নিকট করা উচিত। অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা ঠিক নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে মানুষে মানুষে একে অপরকে সাহায্য করার তাগিদ দেওয়া আছে। মানুষ বিপদে একে অপরকে সাহায্য করবে, একে অপরের সাহায্য নেবে। এভাবে সমবেদনার অনুভূতি সম্পন্ন সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় একটি সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তা হলে প্রশ্ন উঠে, আলোচ্য আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্য প্রার্থনা না করার অর্থ কি? এর সহজ উত্তর হলো এই যে, মানুষের সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া ও নেওয়া যাবে, কিন্তু মানুষকে সাহায্যের একচ্ছত্র অধিকারী বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তার নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে না। আল্লাহর ও মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কখন কীভাবে এবং কোন ক্ষেত্রে মানুষের সহযোগিতা নেওয়া যাবে, একটু ব্যাখ্যা করলে তা বুঝতে সহজ হবে।

প্রথম, কাউকে ভালো-মন্দের নিয়ন্তা, ত্রাণকর্তা বা সর্বময় ক্ষমতাবান মনে করে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। বিষয়টির আরেকটু

গভীর ভাবে উপলব্ধি করা দরকার। যে কোন কর্মে থাকে কার্যকারণ ও কার্যফল, এছাড়াও থাকতে পারে কার্য উপকরণ বা কার্যমাধ্যম। একচ্ছত্র কার্যকারণ (absolute cause) হলেন আল্লাহ। জমিতে কৃষক বীজ বপন করলে, চারা জন্মে, গাছটি বড় হয়, তাতে ফল হয়। বীজ থেকে চারা অঙ্কুরিত হওয়া, মাটি থেকে রস আহরণ করা, গাছ হওয়া, গাছ বড় হওয়া, ফুল ও ফল দেওয়া ইত্যাদি গুণ, বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা আল্লাহরই দান। অর্থাৎ ফসল উৎপন্ন হওয়া এবং ফল দেওয়ার একচ্ছত্র কার্যকারণ হলেন আল্লাহ, যদিও অপরদিকে বলা যায় যে, কৃষকের চাষ ও বীজ বপনের কারণেই ফসল উৎপন্ন হয়। এখানে আসলে ফসল উৎপন্ন হওয়ার মৌলিক ও একচ্ছত্র কার্যকারণ হলেন আল্লাহ, আর কৃষক হলো কার্য উপকরণ বা কার্য-মাধ্যম। বীজ বপন করা হলো মানুষের কাজ, আর তাকে অঙ্কুরিত করে ফলবতি করা আল্লাহর কাজ। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কার্য উপকরণের মাধ্যমে আল্লাহই ফসল উৎপাদন করেন। অর্থাৎ বীজ বপন করা হলো মানুষের কাজ, আর তাকে অঙ্কুরিত করে ফলবতি করা আল্লাহর কাজ।

সুতরাং ভালো ফসলের জন্য আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, অন্য কারো নিকট নয়। কিন্তু সে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে চাষবাসের পর। এখানে কৃষকের কাজ হলো ভাল ফসলের যরুরী শর্ত, আর আল্লাহর সাহায্য হলো যথেষ্ট শর্ত। এ যরূরী শর্ত পূরণের বেলায় মানুষের সাহায্য নেওয়া যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর একচ্ছত্র ও প্রকৃত কার্যকারণ বিশ্বাস করে কাজের মাধ্যম হিসেবে মানুষের সহযোগিতা চাওয়াতে কোন বাধা নেই।

দ্বিতীয়ঃ এমন বিশ্বাস করাও অনুচিত যে, প্রকৃত দাতা তো স্বয়ং আল্লাহ, তবে এ দানের প্রক্রিয়ায় মানুষও অন্তর্ভুক্ত, যাতে মানুষও দানের একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়। এতে করে আল্লাহরই কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যকারণ বলে বিশ্বাস করা হয়। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে একচ্ছত্র ও সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান বিশ্বাস না করেও কারো সাথে এমন আচরণ করা হয় যা

শিরকের পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, অল্প সংখ্যক হলেও কেউ কেউ এমন ভ্রান্ত ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সবকিছু দেন, আর রাসূল তা স্বাধীনভাবে যাকে যতটুকু ইচ্ছা বরাদ্দ দেন। তারা বিশেষ কিছু পেতে চাইলে রাসূলের নিকট চায়, যদিও সাথে সাথে তারা আল্লাহর নিকটও দোয়া করে। এ ধরনের বিশ্বাসকে কুরআনে খণ্ডন করা হয়েছে। এমন আচরণ নিষিদ্ধ করে আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করো, তারা তোমাদের রিযকের মালিক নয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট রিযক প্রার্থনা করো এবং তাঁরই ইবাদত করো।"[৪৬] এ থেকে বুঝা যায়, কাউকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় বলীয়ান মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। এতে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার মাত্রা সংকোচিত হয়। এটি নিঃসন্দেহে শিরক।

তৃতীয়ঃ আল্লাহর কোন সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ করা নিষিদ্ধ যা শিরকের পর্যায়ে পড়ে। যেমন, কেউ কেউ দুনিয়ার কিছু লাভ করার জন্য বা মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দরগাহ বা মাজারে গিয়ে কবরে শায়িত ব্যক্তির আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করে। কেউ পীর-পুরোহিতের সাহায্য চায়। কখনো কখনো তাদের আচরণ উপাসনার পর্যায়ে উপনীত হয়। এমন কি কেউ কেউ কবরকে সেজদাও করে। এটি নিঃসন্দেহে শিরক এবং নিষিদ্ধ।

চতুর্থঃ আখিরাতের ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া, হিদায়াতের পথে থেকে এবং সে পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্যের জন্য একমাত্র আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করতে হবে। এ ব্যাপারে অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না। তৎকালীন আরবের মুশরিকরা একজন প্রধান বিধাতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও বহু দেবতা ও ফেরেশতার উপাসনা করতো। তারা মনে করতো এসব দেবতা প্রধান বিধাতার সান্নিধ্য বা সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করবে। তারা বলতো, "আমরা তো এদের ইবাদত এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।"[৪৭]

---

৪৬ আল-কুরআন ২৯:১৭।

৪৭ আল-কুরআন ৩৯:৩।

এমন আচরণের কঠোর সমালোচনা করে শুধু আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪৮] তবে কুরআন-হাদিস ও দীন সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই, তারা জ্ঞানের জন্য জ্ঞানী ও আলেম ব্যক্তিগণের সাহায্য নেবে। তা শুধু অনুমোদিত নয়, বরং উৎসাহিত। সারকথা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য হাসিল করে দেয়ার জন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না। কাউকে সে সাহায্যের মালিক ও অধিকারী মনে করা শিরকের শামিল, যা নিষিদ্ধ।

পঞ্চমঃ আল্লাহকেই একচ্ছত্র ক্ষমতাবান ও দাতা হিসেবে বিশ্বাস করা, আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করা। তবে বিপদে কারো সাহায্য চাওয়া, ক্ষুধার সময় স্বচ্ছলদের নিকট অন্ন চাওয়া, কোন সংস্থার ব্যবস্থাপকের নিকট চাকরীর জন্য দরখাস্ত করা, এসব চাওয়ার মাঝে আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সংকোচিত হওয়ার কোন বিশ্বাস জড়িত নয়। চাওয়া ও প্রার্থনা আল্লাহরই নিকট, তবে পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট প্রার্থনা করলে বা চাইলে তা নিষিদ্ধ নয়। সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা, দান গ্রহণ, চাওয়া ও পাওয়ার ব্যাপারে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় উৎসাহিত করা হয়েছে। এরূপ সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

(১৫) হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা

পঞ্চম আয়াতে রয়েছে আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা। লক্ষ্যণীয়, সূরা ফাতিহার প্রথম দিকে আল্লাহর প্রশংসা ও ইবাদতের অঙ্গীকারের পর তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় সাহায্য হলো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথের হিদায়াত। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও মুক্তির জন্য সে হিদায়াত অপরিহার্য। এ হিদায়াতের জন্য প্রবল কামনা থাকতে হবে। চেষ্টা থাকতে হবে। আল্লাহর নিকট হিদায়াত চাইতে হবে এবং সে জন্য দোয়া করতে হবে। সূরা ফাতিহার অন্যতম প্রধান বিষয় হলো হিদায়াত কামনা ও দোয়া। এটাই হলো সূরা ফাতিহার প্রধান দোয়া।

---

৪৮ আল-কুরআন ৩৯:২-৩।

হিদায়াত একটা ব্যাপক শব্দ। ইসলামী পরিভাষায় হিদায়াত দানের অর্থ হলো সরল সোজা সত্য পথ দেখানো, সে পথে পরিচালিত করা, দৃঢ়পদ রাখা, এবং এভাবে গন্তব্যস্থলে পৌছে দেওয়া। সুতরাং আল্লাহর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সোজা সত্য পথ প্রদর্শন করো, সে পথে পরিচালিত করো, সে পথে দৃঢ়পদ রাখো, এবং সে পথে পরিচালিত করে আমাদেরকে গন্তব্যস্থল জান্নাতে পৌঁছে দাও। এ পথে চলে দুনিয়াতে যে কল্যাণ পাওয়া যায়, তা দাও। আর আখিরাতে যে মুক্তি ও সাফল্য পাওয়া যায়, তা দান করো। সকল বাতিল, মিথ্যা ও অসত্য পথ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো এবং সে পথের অকল্যাণ, অমঙ্গল ও কুফল থেকে দুনিয়াতে আমাদেরকে রক্ষা করো এবং আখিরাতেও এর করুণ পরিণাম থেকে বাঁচাও। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, পর্যায় ও শাখা-প্রশাখায়, এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি বিভাগের চিন্তা, কর্ম ও বিধি-বিধান তথা গোটা জীবন-ব্যবস্থায় যা সত্য, নির্ভুল ও কল্যাণময় তা-ই আমাদের দেখাও এবং সেপথে চলার তৌফিক দান করো।

নিজ চেষ্টায় সত্য ও সোজা পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য যে পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন সে তুলনায় মানুষের জ্ঞান নিতান্ত কম ও অপ্রতুল। ক্ষুদ্র জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কী মানুষের জন্য কল্যাণকর, আর কী অকল্যাণকর। সুতরাং দেখা যায়, মানুষ একবার যে মতবাদ দেয়, পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়। এভাবে মানব রচিত মতবাদগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা মানুষের নিকটই ধরা পড়ে। ফলে সে আবার অন্য মতবাদ দেয়। পরে তাও আবার অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়। এভাবে ভুলের পর ভুল হতেই থাকে। যেমন, একসময় পুঁজিবাদকে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা মনে করা হতো। কিন্তু তা যখন কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হলো, বরং শোষণ ও বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হলো, তখন সমাজতন্ত্র নামক আরেকটি মতবাদ তৈরি হলো। কিন্তু তাতে কল্যাণ থেকে আরো বেশী অকল্যাণ হলো। আজ বিশ্বমানবতা তাকেও ত্যাগ করলো। কিন্তু কল্যাণ ও মুক্তি কোথায়? আসলে সে মুক্তি ও কল্যাণ রয়েছে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া

জীবন ব্যবস্থায়, যিনি ভাল করে জানেন কোন ব্যবস্থায় আমাদের কল্যাণ আছে। তা হলো ইসলাম, সত্য দীন, সত্যপথ। কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষের পক্ষে সে সত্যপথ খুঁজে নেওয়া অসম্ভব। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকেই হিদায়াত প্রয়োজন। এদিকে ইঙ্গিত করেই প্রথম মানবকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় আল্লাহ বলেছিলেন, যারা দুনিয়াতে আমার প্রেরিত হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় বা দুঃশ্চিন্তা নেই,[৪৯] তারা আবার জান্নাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

গোটা সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি রহস্যে গভীর চিন্তা করলে মানুষ হয়তো এতটুকু বুঝতে পারবে যে, এর পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন, কিন্তু সে স্রষ্টার পূর্ণ পরিচয় নিজেই খুঁজে পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হিদায়াত পাওয়ার জন্য চেষ্টার সাথে সাথে এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। এ দুয়ের সমন্বয় থাকলে হিদায়াত পাওয়া সহজ হয়।

(১৬) হিদায়াত পাওয়ার শর্ত

আল্লাহর নিকট আমরা হিদায়াত প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুলও করেন। কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা দোয়া করো, আমি তার জবাব দেবো (কবুল করবো)।"[৫০] প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে কি হিদায়াতের জন্য আমাদের এই দোয়ার কোন জবাব আল্লাহ দিয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, হ্যাঁ, আল্লাহ এ দোয়ার জবাব দিয়েছেন। সূরা ফাতিহার পরের সূরা অর্থাৎ পরবর্তী সূরা বাকারার প্রথমেই বলা হয়েছে, এ কুরআনই হলো হিদায়াত, যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।[৫১] কিন্তু সবাই কুরআন থেকে হিদায়াত তথা সত্য সোজা পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম)-এর হিদায়াত পাবে

---

৪৯ আল-কুরআন ২:৩৮।

৫০ আল-কুরআন ৪০:৬০।

৫১ আল-কুরআন ২:২।

না। সিরাতুল মুস্তাকীমে হিদায়াতের প্রেক্ষাপটে কুরআনে যেসব বক্তব্য রয়েছে, তা থেকে হিদায়াতের কয়েকটি শর্ত পাওয়া যায়।

প্রথম শর্তঃ সিরাতুল মুস্তাকিমের হিদায়াত পাওয়ার শর্ত হলো সত্য অনুসন্ধানের ইতিবাচক মানসিকতা, এবং সে পথে চলার প্রবল কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়। বাতিলের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভীত হয়ে তা থেকে বাঁচার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি, এবং সত্যপথে চলার মযবুত অঙ্গিকার। এমন মনস্তাত্বিক অবস্থাকেই ইসলামী পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়। কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার শর্ত হলো সেই তাকওয়া, অর্থাৎ তাকওয়ার মানসিকতা। তা না হলে কুরআনী জীবনব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে মুগ্ধ হওয়া যাবে। কিন্তু হিদায়াত পাওয়া যাবে না। এ অর্থেই বলা হয়েছে, কুরআন হলো তাকওয়ার অধিকারীদের জন্য হিদায়াত।[৫২]

দ্বিতীয় শর্তঃ যেহেতু কুরআনই হিদায়াত, অর্থাৎ কুরআনেই হিদায়াতের পথ বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু তাকওয়ার মানসিকতা নিয়ে কুরআন পাঠ করতে হবে, এবং কুরআনে প্রদত্ত জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্ত হলো কুরআন পাঠ করা এবং তা গ্রহণ, ধারণ ও অনুসরণ করা। উল্লেখ্য, কুরআন প্রদত্ত ইসলামী জীবনাদর্শের কিছু বিষয় আছে ইতিবাচক, আর কিছু বিষয় নেতিবাচক। ইতিবাচক হলো করণীয় বা কর্তব্য কাজ। আর নেতিবাচক হলো বর্জনীয় বা নিষিদ্ধ কাজ। গোটা কুরআনে কর্তব্য কাজের নির্দেশ রয়েছে, অপর পক্ষে আছে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ কাজের বর্ণনা। কাজেই হিদায়াত চাইলে কুরআন অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয় শর্তঃ হিদায়াত পেতে হলে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। কারণ কুরআনে বর্ণিত আদর্শের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা রয়েছে হাদীসে। কুরআনে আছে, "নামায কায়েম করো" এবং "যাকাত আদায় করো", ইত্যাদি। কিন্তু কিভাবে তা করতে হবে রাসূলই তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ হিসেবে বলা যায়, আল্লাহর রাসূল হিদায়াতের পথ

---

৫২ আল-কুরআন ২:২।

দেখিয়েছেন, আর আল্লাহই রাসূলকে সে হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন।[৫৩] সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৫৪] আর বলা হয়েছে, রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য সম্ভব।[৫৫] কাজেই হিদায়াত পাওয়ার শর্ত হলো রাসূলের আদর্শ মেনে চলা। রাসূলের সুন্নাহ বা হাদিসকে অস্বীকার করে শুধু কুরআন দ্বারা হিদায়াত পাওয়া যাবে না।

চতুর্থ শর্তঃ হিদায়াত পেতে হলে শুধু হিদায়াতের কামনা, জ্ঞান ও তা অনুসরণের ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, বরং তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও থাকতে হবে। পথ পেয়ে কেউ যদি বসে থাকে এবং সে পথে চলার চেষ্টা না করে, তা হলে তার জন্য সে পথে চলা সম্ভব হবে না। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই হিদায়াত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন, যারা হিদায়াতের পথে চলার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। "আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে হিদায়াত দান করবো।"[৫৬] সুতরাং হিদায়াত পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো কুরআন ও সুন্নাহ তথা আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য চেষ্টা করা।

(১৭) সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ

আমরা আল্লাহর নিকট সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথের হিদায়াত প্রার্থনা করি (আয়াত-৫)। সিরাতুল মুস্তাকীম মানে সোজা পথ। এখন জানা দরকার, সোজা পথ কি, আর সে পথের গন্তব্যস্থল কোথায়। গন্তব্যস্থল হলো জান্নাত, যেখান থেকে আমাদের আদি পিতা আদম ও আদি মা হাওয়া দুনিয়াতে এসেছিলেন। সে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় আগমনের সময় আল্লাহ বলেছিলেন, দুনিয়াতে মানুষের নিকট আল্লাহর

---

৫৩ আল-কুরআন ৯:৩৩।

৫৪ আল-কুরআন ৩:৩২; ৫:৯২।

৫৫ আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করলো," (আল-কুরআন ৪:৮০)।

৫৬ আল-কুরআন ২৯:৬৯।

হিদায়াতের রোডম্যাপ বা নির্দেশনা আসবে। যারা হিদায়াত গ্রহণ করবে তাদের কোন ভয় নেই। তারা সোজা পথ ধরে আবার জান্নাতে ফিরে যেতে পারবে। পৃথিবী থেকে যে পথ ধরে আবার জান্নাতে ফিরে যাওয়া যাবে, তা-ই হলো সোজা পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম। আর এ পথের গন্তব্যস্থল হলো জান্নাত।

সিরাতুল মুস্তাকীম কি? আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা ইসলামই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম। আল্লাহর কিতাব কুরআনে আছে এর বর্ণনা, রাসূলের আদর্শে আছে এর ব্যাখ্যা, আর ইবাদতের মাধ্যমে হয় এর বাস্তবায়ন। এ হিসেবে আল্লাহর দীন ইসলাম, কুরআন, রাসূলের আদর্শ এবং ইবাদত, এর প্রতিটির উপরই সিরাতুল মুস্তাকীম কথাটি প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন,

(১) قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم دينا فيما- (سورة الانعام ١٦١)
(٢) ان الدين عند الله الاسلام- (سورة ال عمران ١٩)
(٣) الم- ذلك الكتاب لا ريب فيه- هدى للمتقين- (سورة البقرة ٢-١)
(٤) فاستمسك بالذى اوحى اليك انك على صراط مستقيم – (سورة الزخرف ٤٣)
(٥) ا ن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم- (سورة ال عمران ٥١)

(১) "বলো, আমার প্রতিপালক আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াত দান করেছেন, যা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দীন।"[৫৭]

(২) "নিঃসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন (জীবন-ব্যবস্থা)।"[৫৮]

(৩) "আলিফ লাম মীম। এটি হলো সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, যা হলো মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।"[৫৯]

(৪) "সুতরাং তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। নিঃসন্দেহে তুমি সিরাতুল মুস্তাকীমে রয়েছ।"[৬০]

---

৫৭ আল-কুরআন ৬:১৬১।
৫৮ আল-কুরআন ৩:১৯।
৫৯ আল-কুরআন ২:১-২।
৬০ আল-কুরআন ৪৩:৪৩।

(৫) "নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার রব (প্রতিপালক) এবং তোমাদেরও রব, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম।"[৬১]

প্রথম আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর দীনই সিরাতুল মুস্তাকীম। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দীন। অর্থাৎ ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দীন বা সিরাতুল মুস্তাকীম। তৃতীয় আয়াতে বুঝা যায়, কুরআন হলো সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রতি হিদায়াত। অর্থাৎ কুরআনই সিরাতুল মুস্তাকীমের দলিল। চতুর্থ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, রাসূলের আদর্শ সিরাতুল মুস্তাকীম। রাসূল (সাঃ) মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্র ও পর্যায় সম্পর্কে উত্তম আদর্শ দিয়েছেন। এগুলোই রাসূলের আদর্শ। রাসূল নিজে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করেছেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের আদর্শ বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কাজেই রাসূলের আদর্শই সিরাতুল মুস্তাকীম।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু মুখে মুখে সোজা পথের স্বীকৃতি দিলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যাবে না। বরং সেখানে পৌঁছতে হলে সে পথে চলতে হবে। অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা শিরোধার্য করে মেনে নিয়ে জীবনে তার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটা দাস যেমন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মনিবের নিকট সমর্পণ করে দেয়, তেমনি আল্লাহর প্রতিটি বান্দার দায়িত্ব হলো আল্লাহর বন্দেগীতে আত্মসমর্পণ করে গোটা জীবনটাকেই ইবাদতে পরিণত করা। এ হিসেবে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তথা জীবন ঘনিষ্ট সার্বিক ইবাদতই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম। সুতরাং উপরে উল্লেখিত পঞ্চম আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর ইবাদতই সিরাতুল মুস্তাকীম। জীবনকে ইবাদতে পরিণত করার জন্য নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সাথে ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়েই আল্লাহর বিধি-বিধান

---

৬১ আল-কুরআন ৩:৫১।

বাস্তবায়ন করতে হবে। তখনই গোটা জীবন হবে ইবাদতময়, এরূপ ইবাদতই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম।

কাজেই দাঁড়ালো এই যে, আল্লাহর দেওয়া দীন তথা ইসলামই সিরাতুল মুস্তাকীম, যার দলিল হলো কুরআন, যার বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে রাসূলের আদর্শে। আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোসহ গোটা জীবনে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হলো প্রকৃত ইবাদত। তা-ই হলো সিরাতুল মুস্তাকীম।

(১৮) নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের পরিচয়

আল্লাহর নিকট আমাদের দোয়া হলো সোজা পথে হিদায়াতের জন্য, যা নিয়ামত প্রাপ্তদের পথ (আয়াত-৬)। নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথ কোনটি? আর নিয়ামতপ্রাপ্তই বা কারা? আসলে মুসলিম-অমুসলিম, কাফির-মুশরিক, ইহুদী-খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ-হিন্দু সবাই তো আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত। দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি, শুনার জন্য শ্রবণশক্তি, চলার জন্য পা, সুস্বাস্থ্য, জীবন ধারণের জন্য খাবার ও পানীয়, আশ্রয়, রোগমুক্তির জন্য আরোগ্যের ব্যবস্থা, এগুলোর সবই আল্লাহর নিয়ামত। সবাই এসব নিয়ামত পাচ্ছে। মানুষ তো পাচ্ছেই, এমনকি প্রাণী ও জন্তু-জানোয়ারও এসব নিয়ামতে সিক্ত। এসব নিয়ামত হলো সাধারণ নিয়ামত। মানুষ-অমানুষ, বাধ্য-অবাধ্য সবাই এসব নিয়ামত পায়। এসব নিয়ামত অর্জন করতে হয় না। আল্লাহর রবুবিয়্যতের অংশ হিসেবে আল্লাহর দয়ায় সবাই এসব নিয়ামত পায়।

আরেক ধরনের নিয়ামত আছে,যা সবাই পায় না। সে নিয়ামত এমনিতেই পাওয়া যায় না, বরং তা অর্জন করতে হয়। তা হলো অর্জিত নিয়ামত। আগুন সবকিছুকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, কিন্তু আগুন ইব্রাহীম (আঃ)-কে পুড়েনি। তাঁকে আগুনে ফেলা হলো, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে তা আরামদায়ক তাপমাত্রায় (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়) পরিণত হলো।[৬২] ঝড়, তুফান ও বন্যায় সকল মানুষ ও প্রাণী

৬২ এ ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা এসেছে। যখন ইবরাহীম (আঃ)- কে শত্রুরা আগুনে নিক্ষেপ করছিল তখন আল্লাহ বলেন: 'আমরা বললাম, হে আগুন তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীম-এর জন্য আরাম ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও' (আল-কুরআন ২১: ৬৯)।

মরে গেলো, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে হযরত নূহ (আঃ)সহ সত্যপন্থীরা বেঁচে গেলেন।[৬৩] হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেওয়া হলো, কিন্তু হযরত লূত ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করা হলো।[৬৪] অনেকে দরিদ্র জীর্ণ শীর্ণ হয়েও দুনিয়াতে এতো সম্মান লাভ করেছেন যে, দুনিয়ার মানদণ্ডে পরাক্রমশালী রাজা বাদশাহ বা ধনকুবেররা তাঁদের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি। এ তো হলো দুনিয়ার কথা। আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে তাদের অনেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে জান্নাতের অপার নিয়ামতের মধ্যে থাকবে। এসব নিয়ামত হলো অর্জিত নিয়ামত। এ নিয়ামত সাধারণভাবে সবাই পাবে না, বরং সাধনার মাধ্যমে এগুলো অর্জন করে নিতে হয়।

কারা এসব অর্জিত নিয়ামতের অধিকারী? কুরআনেই এর জবাব রয়েছে। তারা হলো এমন ব্যক্তি, যারা আল্লাহর দেওয়া দীন ও জীবন-ব্যবস্থা তথা ইসলামকে শিরোধার্য করে নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। নেক কাজ করে। তাকওয়ার অধিকারী হয়। জান-মাল দিয়ে দীন ইসলামের জন্য কাজ করে, মানুষকে সত্যের দিকে ডেকে, মন্দ থেকে বারণ করে। এসব নিয়ামতপ্রাপ্তদের পরিচয় কুরআনের নানা স্থানে দেওয়া আছে। কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলোঃ

(১) ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصلحين - (سورة النساء ١٦٩)

(২) ان الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم جنّت النعيم- (سورة لقمان ٨)

(৩) ان المتقين فى جنّت ونعيم- (سورة الطور ١٧)

(৪) الذين امنوا وهاجروا وجهدوا فى سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنت لهم فيها نعيم مقيم- خلدين فيها ابدا، ان الله عنده اجر عظيم- (سورة التوبه ٢٢-٢٠)

---

৬৩ আল-কুরআন ২৬:১১৯-১২১।

৬৪ আল-কুরআন ৫৪:৩৪-৩৫।

(১) "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাঁদের সাথে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও নেক্কারদের মধ্য থেকে।"[৬৫]

(২) "যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতময় জান্নাত।"[৬৬]

(৩) "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নিয়ামতের মধ্যে।"[৬৭]

(৪) "যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সাফল্যমণ্ডিত। তাদের রব-প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিয়ামত। যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।[৬৮]

লক্ষ্যণীয়, উপরে উদ্বৃত আয়াতগুলোতে এমন সব মানুষের কথা বলা হয়েছে, যারা দুনিয়াতেও আল্লাহর নিয়ামত পেয়েছেন এবং আখিরাতেও পাবেন। তাঁরা সবাই নিয়ামতপ্রাপ্ত। এখন চিন্তার বিষয়, কোন্ পথে চলে তাঁরা নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন, অথবা নিয়ামত প্রাপ্তদের পথ কোনটি? অন্য কথায়, কোন পন্থায় বা কি কাজ করে তাঁরা নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন? তা জানার সহজ উপায় হলো পর্যালোচনা করে দেখা, কি কাজ করার কারণে তাদের জন্য নিয়ামতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের সহজ পরিচয় হলো এই যে, সে পথের পথিকরা দুনিয়ার সকল বাতিল পথ ও মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান ইসলামকে মনে প্রাণে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের প্রতিটি পর্যায় ও ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গভাবে

---

৬৫ আল-কুরআন ৪:৬৯।

৬৬ আল-কুরআন ৩১:৮।

৬৭ আল-কুরআন ৫২:১৭।

৬৮ আল-কুরআন ৯:২০-২২।

তার বাস্তবায়ন করে। সে পথের পথিক হলো এমন মানসিকতার অধিকারী, যা তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং ভালোকাজে উদ্বুদ্ধ করে (তাকওয়া)। যারা ঈমানের সাথে নেক আমল করে এবং আল্লাহর দীনের জন্য জান-মাল দিয়ে প্রচেষ্টা চালায় (আল্লাহর পথে জিহাদ)। সকল প্রকার মন্দ কাজ ত্যাগ করে এবং প্রয়োজনে দীনের জন্য দেশ ত্যাগ (হিজরত) করে । এক কথায় তাদের ইবাদত, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য। যারা আল্লাহ ও রাসূলের এমন আনুগত্যের পথে চলে, তারাই অর্জিত নিয়ামতপ্রাপ্ত মানুষ। এ পথ হলো নবী-রাসূল, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও নেক্কারদের পথ।

(১৯) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ অনুসরণ ও সঙ্গ গ্রহণ

সূরা ফাতিহায় অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে হিদায়াতের দোয়ার মাধ্যমে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণা রয়েছে। কারো মনে যদি সত্যি সে পথে হিদায়াতের কামনা থেকে, তা হলে নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের পরিচয়ই যথেষ্ট নয়, বরং তাদের মধ্যে সে পথে চলার চেষ্টা থাকতে হবে। তাদের উচিত হবে কুরআনে মানব ইতিহাসের যেসব নবী-রাসূল ও নেক্কারদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা অধ্যয়ন করা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা। নিয়ামতপ্রাপ্তদের পথে হিদায়াত পেতে হলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে তাঁদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা যে কাজ করেছেন তা করতে হবে। আর যে কাজকে তাঁরা জীবনের ব্রত বানিয়ে নিয়েছিলেন, সে কাজে ব্রতী হতে হবে। শুধু তাই নয়, বরং বর্তমানে যারা সত্যপথে রয়েছে তাদের সঙ্গে থাকতে হবে এবং তাদের সঙ্গ গ্রহণ করতে হবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে বাতিলপন্থীদের সঙ্গ গ্রহণ করা নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে হিদায়াতের দোয়ার পরিপন্থী।

(২০) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে আত্মরক্ষা

মানব ইতিহাসে যারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট, তাদের পথ থেকে বাঁচাবার জন্য সূরা ফাতিহায় দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (আয়াত-৭)। আমরা সে পথ থেকে বাঁচতে চাই যে পথে চলে মানুষ আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে, বা গযবের পাত্র হয়েছে।

আমরা যদি সত্যি মনে-প্রাণে এ দোয়া করে থাকি, তবে এ দোয়া থেকে আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম, ক্রোধে পতিতদের পথ এবং পথভ্রষ্টদের পথ থেকে আত্মরক্ষার প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্খা থাকতে হবে। দ্বিতীয়, ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্টদের পথের পরিচয় জানতে হবে। তৃতীয়, এ পথ জানার পর তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহর ক্রোধ বা গযবে পতিত মানুষের পথ কোনটি, তার পরিচয় কুরআন ও হাদীসে আছে। এটি হলো তাদের পথ যারা হক ও সত্যপথকে জানে, চিনে ও বুঝে। কিন্তু বুঝে শুনে তারা খারাপ ও বাতিল পথে চলে। জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা প্রবৃত্তির তাড়নায়, দুনিয়ার লোভে এবং অহমিকার বশবর্তী হয়ে এরূপ আচরণ করে।

জেনে-শুনে সজ্ঞানে বাতিল ও মন্দ পথে চলার উদাহরণ হলো ইহুদী সম্প্রদায়। তারা তাওরাতে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও শেষ নবী (সাঃ)-কে অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহর গযব বা ক্রোধে পতিত হয়েছে বলে কুরআনেই উল্লেখ আছে।[৬৯] এ মর্মে একটি হাদিসও আছে যে, ক্রোধ বা গযবে পতিত মানুষ দ্বারা ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তবে আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের আচরণ শুধু ইহুদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জেনে-শুনে যারাই মন্দ কাজ করে, তারাও ক্রোধের কাজ করে। যেমন, ইসলাম ত্যাগ করা, সত্যের

---

৬৯ আল-কুরআন ২:৬১।

পথে জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রর্দশন করা ইত্যাদি আচরণও ক্রোধে পতিত হওয়ার মতো কাজ। আল্লাহ বলেন,

(১) "আর যে ব্যক্তি কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ।"[৭০]

(২) "আর যে ব্যক্তি সেদিন যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন অথবা নিজ সৈন্যদের নিকট ফিরে আসা ছাড়া (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে প্রত্যাবর্তন করবে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে, আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।"[৭১]

(৩) "সে বললোঃ তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে গেছে।"[৭২]

উপরে উল্লেখিত তিনটি আয়াতে ক্রোধে পতিত তিন ধরনের মানুষের কথা বলা হয়েছে, এবং গযব শব্দটি তাদের সবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম, যারা মুসলমান অবস্থা থেকে নাস্তিক হয়ে যায়, কাফির হয়ে যায়, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ বা গযব। তবে বিপদে প্রাণ রক্ষার জন্য শত্রুদের নিকট কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে গযবে পতিত হবে না। দ্বিতীয়,যারা জিহাদে যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন ছাড়া পলায়নের জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ বা গযব । তৃতীয়, নবী হুদ (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আ'দ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর ক্রোধ বা গযব পতিত হয়। এদের কেউই ইহুদী নয়, অথচ তাঁরাও আল্লাহর গযবে পতিত। লক্ষ্যণীয়, এক কথায় কাফির ও সত্য-বিরোধী মানুষ আল্লাহর ক্রোধে পতিত।

এবার পথভ্রষ্টদের পথের পরিচয় জানা প্রয়োজন। পথভ্রষ্ট হলো তারা যারা জ্ঞানের অভাবে মন্দ পথে চলে। এর উদাহরণ হলো খ্রিষ্টান সম্প্রদায়।[৭৩] তারা এতো অজ্ঞ যে, তারা আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ হযরত

---

৭০ আল-কুরআন ১৬:১০৬।

৭১ আল-কুরআন ৮:১৬।

৭২ আল-কুরআন ৭:৭১।

৭৩ আল-কুরআন ৫:৭৭।

ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে, তাঁর মাতা মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী এবং স্বয়ং আল্লাহকে তাঁর পিতা বলে বিশ্বাস করে। তবে এ ভ্রষ্টতা খ্রিষ্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহকে অস্বীকার করা (কুফরী করা), আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা, শিরক করা, অন্যায় কাজ করা, অন্যের উপর অত্যাচার করা, এসব আচরণকেও কুরআনে পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

(১) "যারা কাফির হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, তারা অতি দূরের ভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট।"[৭৪]

(২) "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার (শিরক) করে, সে অতি দূরের ভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট।"[৭৫]

(৩) "বরং যালেমরা সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট।"[৭৬]

(৪) "নিঃসন্দেহে অপরাধীরা (গোনাহগাররা) পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত।"[৭৭]

(৫) "সুতরাং হক ও সত্যের বাইরে যা আছে তাই পথভ্রষ্টতা।"[৭৮]

উপরের প্রথম তিনটি আয়াতে কাফির, মুশরিক ও যালেমকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে সকল অপরাধীকেই পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। আসলে পথভ্রষ্ট না হয়ে (অর্থাৎ সুপথে থেকে) কেউ অপরাধের দিকে পা বাড়াতে পারে না। অন্ততঃপক্ষে যতক্ষণ মানুষ অপরাধে নিমজ্জিত থাকে অথবা কুপথে থাকে, ততক্ষণ সে সোজা পথের বাইরে অর্থাৎ পথভ্রষ্টতায় অবস্থান করে। পঞ্চম আয়াতে তো পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে, যা সত্য এবং দীনের বহির্ভূত, তাই পথভ্রষ্টতা।

মোটকথা, ইসলাম তথা আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধানের বাইরে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী, সবকিছুই পথভ্রষ্টতা।

---

৭৪ আল-কুরআন ১৬:১০৬।
৭৫ আল-কুরআন ৮:১৬।
৭৬ আল-কুরআন ৭:৭১।
৭৭ আল-কুরআন ৫:৭৭।
৭৮ আল-কুরআন ১০:৩২।

গযব বা ক্রোধে পতিতদের পথ এবং পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং কুরআনে এসব বাতিল ও মন্দ পথের পরিচয় দান তখনই অর্থবহ হবে, যখন আমরা প্রবল মনোবল নিয়ে এসব পথ থেকে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করি। এসব খারাপ আচরণ ও পথ জানার পরও কেউ যদি সে পথেই চলে, অথচ প্রতিদিন প্রতি নামাযের প্রতি রাকাতে সে পথ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তার এ আচরণ অনেকটা আল্লাহর সাথে ঠাট্টার মতো।

(২১) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ : ক্রোধে পতিত অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের সঙ্গ বর্জন

কারো মনে যদি সত্যি ক্রোধে পতিত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া ও কামনা থাকে, তা হলে সে শুধু ক্রোধে পতিত ও অভিশপ্তদের পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও চেষ্টাই করবে না, বরং সে পথের পথিকদের দলভুক্তও হবে না, তাদের সঙ্গ গ্রহণ করবে না এবং তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেবে না। এটাই স্বাভাবিক।

বন্ধুত্ব ও সঙ্গ দ্বারা একজন মানুষের আসল রূপ জানা যায়। একজন ভালো লোক কোন মন্দ লোকের সাহচর্যে টিকতে পারে না। এমন ঘটনা খুব বিরল যে, একজন সৎ লোক অসৎ-ধূর্ত-কপট ব্যক্তিদেরকে বন্ধু ও সঙ্গী বানিয়ে তাদের সাহচর্য উপভোগ করে। বরং পানির মাছকে ডাঙ্গায় উঠালে যেমন ছটফট করে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়, তেমনি দশা হয় কোন সৎ ও ভালো মানুষের, যখন সে অসৎ ও ধূর্ত মানুষের সাহচর্যে আসে। কাজেই কোন হিদায়াত প্রার্থী ভালো লোক অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষের দলভুক্ত হতে পারে না। আল্লাহ বলেন, (১) "হে ঈমানদাগণ,কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।"[৭৯] "মুমিনরা যেনো মুমিন ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা করো, তবে তাদের

৭৯ আল-কুরআন ৪:১৪৪।

সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।"[৮০] (৩) "হে ঈমানদারগণ, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (এরূপ) যালেমদের হিদায়াত করেন না।"[৮১] (৪) "নিঃসন্দেহে শয়তান হলো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার দলকে (নিজের দিকে) কেবল এজন্য আহবান করে যেনো তারা জাহান্নামী হয়।"[৮২] (৫) "তারা যদি আল্লাহ ও নবীর প্রতি এবং নবীর প্রতি নাযিলকৃত (কিতাব)-এর প্রতি ঈমান রাখতো তা হলে ওদেরকে (কাফেরদেরকে) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না।"[৮৩]

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, মুমিন ও মুসলমানগণ কখনো কাফির, মুশরিক ও শয়তানকে[৮৪] বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, তাদের কাজ হলো মানুষকে কুপথে আকর্ষণ করা এবং বাতিলের পথে পরিচালিত করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সামাজিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে বিরোধিতার ঘোষণা দিয়ে দ্বন্দে লিপ্ত হবে। শান্তিচুক্তি বা প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও পার্থিব সহযোগিতা বজায় রাখা প্রয়োজন। মানুষে মানুষে ভাই ভাই, এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রক্ষা করা কর্তব্য।

সারকথা, সূরা ফাতিহায় আল্লাহর ক্রোধে (গযবে) পতিত এবং পথভ্রষ্টদের থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কুরআন পাঠের মাধ্যমে এসব বাতিল পথ জানতে হবে, এসব পথ ত্যাগ করতে

---

৮০ আল-কুরআন ৩:২৮।

৮১ আল-কুরআন ৫:৫১।

৮২ আল-কুরআন ৩৫:৬।

৮৩ আল-কুরআন ৫:৮১।

৮৩ আল-কুরআন ৫:৮১।

৮৪ শয়তান বলে মানুষ-শয়তান ও জিন-শয়তান উভয়কে বুঝানো হয়েছে। যেসব মানুষ সত্যের বিরোধিতা ও শত্রুতায় শয়তানের মতো আচরণ করে, তারা হলো মানুষ শয়তান। দ্রষ্টব্য আল-কুরআন ৫৮:১৯;১১৪:১-৬।

হবে, এবং যারা এসব পথে চলে তাদের সঙ্গ ও দল বর্জন করতে হবে। তা যদি না করা হয় তবে আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করার কি অর্থ থাকতে পারে?

(২২) দোয়া ও প্রার্থনা করার নিয়ম

পরোক্ষভাবে সূরা ফাতিহায় আল্লাহর নিকট দোয়া ও প্রার্থনা করার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (আয়াত-১)। কারো নিকট কিছু চাইতে হলে তার প্রশংসা করে সুসম্পর্ক স্থাপন করা উত্তম। কারো নিকট চাওয়া বা প্রার্থনা করার প্রকৃত স্বত্ত্বা তো আল্লাহই। সুতরাং তাঁর নিকট দোয়া করতে হলে বা কোন কিছু প্রার্থনা করতে হলে প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করে নেওয়া উচিত। সূরা ফাতিহায় ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা ও ইসলামী বিশ্ব-দর্শনের প্রায় সকল মৌলিক বিষয়ের ঘোষণা দেওয়ার পর প্রধানত একটা দোয়া রয়েছেঃ "আমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দাও"। এ দোয়ার ভুমিকা হিসেবে প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা *(আলহামদুলিল্লাহ), আল্লাহর দয়া ও করুণা এবং তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের* ঘোষণা রয়েছে (আয়াত-১-৩)। তারপর আছে আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি। এরপরই রয়েছে দোয়া। এখান থেকে শিক্ষা হলো এই যে, আল্লাহর নিকট দোয়া ও প্রার্থনা করতে হলে প্রথমে তাঁর প্রশংসা করা উচিত। এমন কথা বলা উচিত যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। কারণ, এ প্রশংসার মাঝে মানব সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সুরই অন্তর্নিহিত রয়েছে। ইবাদতের জন্য মানুষের সৃষ্টি, আর আল্লাহর প্রশংসা নিঃসন্দেহে একটি ইবাদত। "আলহামদু লিল্লাহ" বলে আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ যে কতো খুশী হন, তা একটি হাদীসে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছেঃ

عن ابى موسى الاشعرى رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملئان ما بين السموت والارض- (رواه مسلم، كتاب الطهارة – رقم الحديث : ١)

"আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্' (নেকীতে) পাল্লা ভরে দেয় এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ্' পৃথিবী ও আকাশসমূহের মধ্যবর্তী স্থান (নেকীতে) ভরে দেয়।"[৮৫]

সুতরাং "আলহামদু লিল্লাহ"বলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পর দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অতএব আলহামদু লিল্লাহ দ্বারাই দোয়া শুরু করা উচিত।

শুধু দোয়াই নয়, বরং সকল কাজের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করে নেয়া ভালো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

كل امر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو ابتر- (- رواه ابوداؤد، كتاب الادب - رقم الحديث : ١٨، ابن ماجه - كتاب النكاح)

"যেসব কাজ আল্লাহর প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ) ব্যতীত শুরু করা হয় তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ।"[৮৬]

সুতরাং, আলহামদু লিল্লাহ দ্বারা কাজ শুরু করা সুন্নত। এতে সওয়াব তো আছেই, কর্ম সম্পাদনে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

(২৩) সামষ্টিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব

যারা একই ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী এবং একই পথের যাত্রী, কুরআন তাদের মধ্যে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে "মুমিনরা ভাই ভাই"।[৮৭] সূরা ফাতিহায় তার একটা বাস্তব প্রশিক্ষণ রয়েছে। এ সূরায় ইবাদতের প্রতিশ্রুতি, সাহায্যের প্রার্থনা এবং হিদায়াতের দোয়ার ক্ষেত্রে এক বচনের পরিবর্তে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'আমি' না বলে 'আমরা' বলা হয়েছে। 'আমাকে' না বলে 'আমাদেরকে' বলা হয়েছে। যেমন,'আমি একমাত্র তোমারই

---

৮৫ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাহ, হাদিস নং-১।

৮৬ আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদিস নং- ১৮, ইবনে মাজাহ, নিকাহ পর্ব।

৮৭ আল-কুরআন ৪৯:১০।

ইবাদত করি' না বলে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি' বলা হয়েছে।'আমি শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'না বলে'আমরা শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'বলা হয়েছে। আর 'আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীম এর হিদায়াত দাও' না বলে 'আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীম এর হিদায়াত দাও' বলা হয়েছে।

এভাবে 'আমি' না বলে 'আমরা' এবং 'আমাকে' না বলে 'আমাদেরকে' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে রয়েছে সবার পক্ষ থেকে ইবাদতের প্রতিশ্রুতি, মুসলিম উম্মতের সকলের জন্য সাহায্য প্রার্থনা, এবং তাদের সবার জন্য হিদায়াত প্রার্থনা। এভাবে এখানে ব্যাষ্টির পরিবর্তে সামষ্টিকতার প্রতিফলন ঘটানে হয়েছে পরিষ্কারভাবে।

আসলে ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থের সাথে সাথে সামষ্টিক স্বার্থের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সামষ্টিকতার বিষয়টি সকল ব্যাপারে-ই লক্ষ্যণীয়। প্রথম, শুধু ব্যক্তিজীবনে একাকী নয়, বরং সামষ্টিক জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। ইসলামে ধর্মকর্ম একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং ব্যক্তির সাথে সমষ্টি ও জাতি সম্পৃক্ত। একাকী নামায অনুমোদিত হলেও জামাতে নামায উৎসাহিত। দ্বিতীয়, রোযা ও হজ্জের আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোতে সামষ্টিকতা ও সামাজিকতার আমেজ রয়েছে। একই সময় এবং একই সাথে রোযা, ঈদ ও হজ্জ ইত্যাদিতে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সামাজিক পর্যায়ের আনুগত্যের শিক্ষা রয়েছে। তৃতীয়, মঙ্গল ও কল্যাণ সকলের জন্যই কাম্য। আল্লাহর সাহায্য, সত্য-সোজা ও নিয়ামত প্রাপ্তদের পথের হিদায়াত, এবং সকল প্রকার কল্যাণ কামনা সবার জন্য ও সবার পক্ষ থেকে করতে হবে। চতুর্থ, আল্লাহর ক্রোধের পথ এবং ভ্রষ্টতাসহ সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে সবার জন্যই মুক্তি কামনা করতে হবে। সূরা ফাতিহার প্রতিটি বক্তব্য, নিবেদন, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গিকার ও দোয়াতে সে সামষ্টিকতার প্রতিফলন রয়েছে। এক কথায় ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে সামষ্টিক কল্যাণ সূরা ফাতিহার অন্যতম শিক্ষা।

(২৪) কোন কাজ আরম্ভ করার নিয়ম

"বিসমিল্লাহ" বা আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা (সূরা তওবা ব্যতীত)। এতে ইসলামী সংস্কৃতির একটি শিক্ষা রয়েছে। ইসলামী জীবনদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো সকল কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা। এটি হলো ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং শুধু দোয়া নয়, বরং সব কাজই বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা উচিত।

রাসূল (স) বলেন, "যেসব কাজ আল্লাহর প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ) ব্যতীত শুরু করা হয় তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ।"

সুতরাং বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করা সুন্নত। সুন্নতের সওয়াব ছাড়াও এতে একাধিক উপকার পাওয়া যায়।